ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 721- 742
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.284

উপন্যাসের ঊর্মিতে, মনস্তত্ত্বের গহনে শ্যেনদৃষ্টি

বর্ণালী ভৌমিক (ঘোষ), *সহযোগী অধ্যাপিকা এবং বাংলা বিভাগীয় প্রধান, বীর বিক্রম মেমোরিয়াল কলেজ, ত্রিপুরা, ভারত*

Received: 12.03.2026; Accepted: 14.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

This paper offers a comprehensive critical analysis of *Putul Nacher Itikatha* by Manik Bandopadhyay, focusing on its thematic, structural, and philosophical dimensions. It examines the significance of the novel's title as a metaphor for human existence, where individuals appear as puppets controlled by complex social relations rather than supernatural determinism. The study highlights the interplay between nature, environment, and human psychology, emphasizing how biological impulses and socio-economic conditions shape character behavior. The language of the novel—marked by a blend of *sadhu* and *cholito* forms—is analyzed as a powerful narrative tool that enhances realism and emotional depth. Furthermore, the paper explores the influence of Freudian psychoanalysis in depicting suppressed desires, particularly through the characters of Shashi and Kusum. The conflict between tradition and modernity is examined through the father-son relationship between Gopal and Shashi, reflecting broader tensions within middle-class society. By comparing Manik's vision with Sarat Chandra Chattopadhyay's *Pallisamaj*, the study underscores differing approaches to rural life and human suffering. Ultimately, the novel emerges as a profound exploration of determinism, human agency, and existential crisis in modern Bengali literature.

Keywords: Determinism and Human Agency, Psychoanalytic Criticism, Rural Society and Modernity, Language and Narrative Technique, Existential Crisis

সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত দুমকা শহরে ১৯০৮ সালে ১৯শে মে, মঙ্গলবার (১৩১৫ বঙ্গাব্দের ৬-ই জ্যৈষ্ঠ) জন্মগ্রহণ করেন প্রবাদপ্রতিম কথাশিল্পী প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ওরফে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলাদেশের ঢাকার অন্তর্গত, বিক্রমপুরের মালপদিয়া গ্রামে ছিল তাঁর পিতৃনিবাস। পিতা হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন সেটেলমেন্ট বিভাগের কানুনগো ও সাব-ডেপুটি কালেক্টর এবং মাতা নীরদা দেবীর নৈকট্যে- তত্ত্বাবধানে বাল্যশিক্ষা লাভ করার পর বিক্ষিপ্তভাবে বিদ্যালয়ের শিক্ষা-জীবনের সূচনা হয়; প্রধানত— দুষ্কা, আড়া, সাসারাম, মেদিনীপুর জেলার বেশ কিছু অংশ, কুমিল্লার অন্তর্গত ব্রাহ্মণ বেড়িয়া, বারাসাত, কলকাতা, ময়মনসিংহের টাঙ্গাইলে ছাত্রজীবন অতিবাহিত। অতঃপর মেদিনীপুর থেকে ১৯২৬ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষা দেওয়া ও পরবর্তীকালে বাঁকুড়ার ওয়েলিয়ান মিশন কলেজ থেকে ১৯২৮ সালে আই.এস-সি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ

হয়ে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে গণিত শাস্ত্রে সাম্মানিক সহ বি.এস.সি ক্লাসে প্রবেশ। এর মধ্যে ১৯২৪ সালে ২৮ শে মে, ছাত্রাবস্থায় টাঙ্গাইলে লেখকের মাতৃবিয়োগ ঘটে।

সহপাঠীদের সঙ্গে বাজি ধরেই তাঁর সাহিত্যজীবনের সূত্রপাত। প্রথম গল্প 'অতসীমামী' ১৯২৮ সালের ডিসেম্বর (১৩৩৫ বঙ্গাব্দের পৌষ) সংখ্যায়, 'বিচিত্রা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তবে এর পূর্বে ষোল বছর বয়স থেকেই তিনি কবিতা লিখেছেন। তাই সাহিত্যচর্চা তাঁর রক্ত মজ্জায় অন্বিত। এরপর ঐ একই পত্রিকায় ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের আষাঢ় ও ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশ পায় 'নেকি' ও 'ব্যথার পুজা'; এই সাল থেকেই 'দিবারাত্রির কাব্য' উপন্যাসটির জন্ম হয়, অর্থাৎ শিক্ষাজীবনের সূর্য অস্তমিত হয় ও সাহিত্য- সূর্যের উদয় ঘটে। 'বঙ্গশ্রী পত্রিকায়' ১৯৩৪ সালে 'দিবারাত্রির কাব্য' উপন্যাসটি, 'একটি দিন' শিরোনামে বড়োগল্প রূপে প্রকাশ ঘটলে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিভা, ধারাবাহিক রচনার মধ্যে দিয়ে বিকশিত হয় ও পাঠকসমক্ষে সমালোচিত হতে শুরু করে। 'পদ্মানদীর মাঝি'-ও তিনি 'পূর্বাশা' পত্রিকায় ধারাবাহিক রচনার মধ্যে দিয়ে সর্বপ্রথম রূপ দিয়েছিলেন। তবে, পত্রিকাটির প্রকাশ বন্ধ হওয়ার দরুণ উপন্যাসটির প্রকাশও অসমাপ্ত থাকে। এরপর 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায়, ১৩৪১ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যা থেকে 'পুতুল নাচের ইতিকথা' উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে শুরু হয়। একজন ব্যক্তিত্বপূর্ণ খাঁটি গ্রন্থকারের আবির্ভাব ঘটে এই সময় থেকেই। 'অতসীমামী' পরিমার্জিত প্রথম গল্পগ্রন্থ রূপে এবং 'জননী' উপন্যাস রূপে প্রকাশিত হয় এই সময়েই। ১৯৩৬ সালেই তাঁর গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় 'পদ্মানদীর মাঝি,' 'পুতুল নাচের ইতিকথা,' 'জীবনের জটিলতা।' ১৯৩৭ সালে তাঁর দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ 'প্রাগৈতিহাসিক'-এর মুক্তি ঘটে। এই সালেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন 'বঙ্গশ্রী' নামক মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকার সহ-সহকারী সম্পাদকের পদে নিযুক্ত হয়ে। দক্ষিণ কলকাতার টালিগঞ্জের দিগম্বরী তলায় পৈতৃক বাড়িতে থেকে তিনি অতঃপর সাহিত্য সাধনায় জীবন শুরু করেন।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বৈবাহিক জীবনের সূচনা ঘটে ১৯৩৮ সালের ১১ই মে (১৩৪৫ বঙ্গাব্দের ২৮-শে বৈশাখ)। এই সময় তিনি বিক্রমপুরের সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের তৃতীয়া কন্যা শ্রীযুক্তা কমলাদেবী-কে বিবাহ করেন। এই সময়পর্বেই তাঁর 'অমৃতসা পুত্রাঃ' উপন্যাসটি ও 'মিহি ও মোটা' গল্পগ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। ১৯৩৯ সালের পয়লা জানুয়ারী তিনি 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকার সহ-সহকারী সম্পাদকের পদ থেকে ইস্তফা দেন। এই বছরই ভ্রাতা সুবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় 'উদয়াচল প্রিন্টিং অ্যান্ড পাবলিশিং হাউস' নামক ছাপাখানা ও প্রকাশনালয় (প্রেস) স্থাপন করেন এবং ১৯৪০ সালে নিজস্ব প্রেস থেকেই প্রকাশ করেন গল্পগ্রন্থ 'বৌ'। 'পরিচয়' পত্রিকার মাধ্যমে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ধারাবাহিক উপন্যাসরূপে 'অহিংসা'-র প্রকাশ করেন। এই সময়ই তাঁর 'সরীসৃপ' গল্পগ্রন্থের প্রকাশ ঘটে। তাঁর লেখা 'শহরতলি' উপন্যাসের হাত ধরেই শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকার, শারদ সংখ্যায় একটি সম্পূর্ণ উপন্যাস প্রকাশের রীতির সূচনা ঘটে। ১৯৪০ সালে 'শহরতলি'-র প্রথম পর্ব গ্রন্থাকারে প্রকাশ পায় এবং ঠিক তার পূর্ব বছর 'পরিচয়' পত্রিকায় কার্তিক সংখ্যায় তিনি প্রথম স্বতন্ত্র প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ১৯৪১ সালে তাঁর তিনটি উপন্যাস— 'শহরতলি দ্বিতীয় পর্ব', 'অহিংসা' ও 'ধরাবাঁধা জীবন' গ্রন্থকারে প্রকাশিত হয়। তবে মানিকের সঙ্গে শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকার যোগ নিবিড়। এই পত্রিকাতেই ১৯৪২ সালে দুটি অসাধারণ উপন্যাস 'শহরবাসের ইতিকথা' ও 'চতুষ্কোণ' প্রকাশিত হয়। ১৯৪৩ সালে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তৎকালীন ভারত সরকারের 'National *War* Front' এর 'Bengal Branch এ Publicity Assistant'-এর পদে যোগদান করেন এবং 'All India Radio'-র কলকাতা কেন্দ্র থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংক্রান্ত তথ্যাবলী, বৈচিত্র্যময় বেতার অনুষ্ঠানে যুক্ত থাকেন। এই সময়ই তাঁর 'সমুদ্রের স্বাদ' গল্পগ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। শারদীয়ার 'যুগান্তর' পত্রিকায় 'প্রতিবিম্ব' উপন্যাসটি প্রকাশ পেলে তাঁর মনন-চিন্তা-চেতনা আপামর পাঠক সমক্ষে প্রকাশ পায়।

কথাসাহিত্যিক মানিকের জীবনে কমিউনিজম্ চিন্তা-চেতনা গভীর ভাবে প্রথোত। ১৯৫৫ সালে তিনি স্বয়ং 'ফ্যাসিস্ট-বিরোধী-লেখক ও শিল্পী সংঘের' দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলনে সভাপতি মন্ডলের সদস্যরূপে নির্বাচিত হন এবং প্রগতিশীল লেখক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থেকে, সক্রিয়ভাবে একাধিক উপন্যাস-ছোট গল্পে তৎকালীন মধ্যবিত্ত সমাজ ও তার অর্থনৈতিক সংকট, অস্তিত্বের বিপন্নতাবোধ ও প্রগতিশীল চিন্তাধারার বাস্তব রূপায়ণ ঘটান। প্রগতিশীল লেখক ও শিল্পী সম্মেলনের সাধারণ অধিবেশনে সভাপতি পদ অলংকৃত করাকালীন, তাঁর গল্প সংকলন 'ভেজাল' প্রকাশিত হয়। ১৯৪৪ সালে এবং ১৯৪৫ সালে প্রকাশিত হয় উপন্যাস 'দর্পণ' ও গল্পগ্রন্থ 'হলুদ পোড়া'। ১৯৪৬-১৯৫০ সাল পর্যন্ত সময়পর্বটি লেখকজীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে এসেছে। কারণ, এ সময়ই পরপর অসামান্য রচনাগ্রন্থ প্রকাশিত হয— ১৯৪৬ সালে 'শহরবাসের ইতিকথা' (উপন্যাস), 'ভিটেমাটি' (নাটক), 'আজকাল পরশুর গল্প' (গল্পগ্রন্থ), 'চিন্তামণি' (উপন্যাস) 'পরিস্থিতি' (গল্পগ্রন্থ); ১৯৪৭ সালে— 'চিহ্ন' (উপন্যাস), 'আদায়ের ইতিহাস' (উপন্যাস), 'খতিয়ান' (গল্পগ্রন্থ); ১৯৪৮ সালে— 'ছোটবড়ো', 'মাটির মানুষ', ১৯৪৯ সালে 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী' (গল্পগ্রন্থ); ১৯৫০ সালে— 'জীয়ন্ত' (উপন্যাস), 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প'।

১৯৪৯ সাল থেকেই লেখকের সাহিত্য জীবন গোধূলির আলোর স্পর্শ পায়। কারণ, এই সময়েই তিনি পৈতৃক ভিটে ত্যাগ করে বরানগরে, গোপাললাল ঠাকুর রোড এর ভাড়াবাড়িতে উঠে আসেন। এ সময় থেকেই বিশেষত ১৯৫১ সাল নাগাদ, চরম দারিদ্রতা ও অসুস্থতা তাঁর জীবনকে গ্রাস করেছিল, তবু তিনি সাহিত্য সাধনা থেকে বিরত থাকেন নি। কারণ, ১৯৫১ সালে প্রকাশিত হয় চারটি উপন্যাস— 'পেকনশা', 'সোনার চেয়ে দামি', 'স্বাধীনতার স্বাদ', 'ছন্দপতন', ১৯৫২ সালে বসুমতী সাহিত্য মন্দির কর্তৃক প্রকাশিত হয় মানিক গ্রন্থাবলীর দ্বিতীয়ভাগ, ১৯৫৩ সালে প্রকাশিত হয় উপন্যাস— 'নাগপাশ', 'আরোগ্য', 'চালচলন', 'তেইশ বছর আগে পরে' এবং গল্পগ্রন্থ— 'ফেরিওলা', 'লাজুকতা', ১৯৫৪ সালে প্রকাশিত হয় 'হরফ' (উপন্যাস), 'শুভাশুভ' (উপন্যাস)। এই সময় তিনি অত্যাধিক অসুস্থ হয়ে পড়ায় দারিদ্রতা চরমে ওঠে ও লেখকমন ক্রমশই সঞ্জীবনী জীবনসুধা হারিয়ে ফেলে নেতিবাচক ভাব মানসিকতার অধিকারী হয়ে পড়েন। আত্মদ্বন্দ্বে লেখকমন বিদীর্ণ, আত্মকষ্টে রূদ্ধ, আত্মরক্ষায় বিপন্ন হয়ে পড়ে তাঁর মানসিকতা, অবশেষে একান্তই ইচ্ছার বিরুদ্ধতায় তিনি চিকিৎসার জন্য ভর্তি হন ইসলামিয়া হাসপাতালে। তবে আত্মপ্রত্যয়ে বলিষ্ঠ লেখক অল্পদিন পরেই স্থায়ী চিকিৎসার বিরুদ্ধে গিয়ে নিজবাসস্থানে ফিরে আসেন, শেষে তাঁকে লুম্বিনি পার্ক মানসিক চিকিৎসালয়ে প্রায় দু-মাস চিকিৎসাধীনে রাখা হয়। এই সালেও অদম্য মানসিক জোরের কাছে হার মানেনি লেখনী প্রতিভা, প্রকাশিত হয় উপন্যাস 'পরাধীন প্রেম (১৯৫৫)। পরের বছর 'হলুদ নদী সবুজ বন' (উপন্যাস) প্রকাশের পর লেখক নতুনভাবে ভাবায় পাঠককে। তবে ১৯৫৬ সাল থেকে তিনি বাসিলারি ডিসেন্ট্রির আক্রমণে অসুস্থ হয়ে পরেন। এই সময়ই তাঁর জীবনের শেষ গল্প সংকলন 'স্ব-নির্বাচিত গল্প' ও উপন্যাস 'মাশুল' প্রকাশিত হয়। ১৯৫৬ সালের ৩-রা ডিসেম্বর (১৩৬৭ বঙ্গাব্দের ১৭-ই অগ্রহায়ণ) সোমবার নীলরতন সরকার হাসপাতালে প্রবাদ প্রতিম মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে– সমাপ্ত হয় সাহিত্যরচনার ইতিকথা।

ক

যে কোন সাহিত্যসৃষ্টিতে নামকরণের সার্থকতা অবশ্য আলোচ্য বিষয়; কারণ, নামকরণের মধ্যেই স্রষ্টার ভাবনা- মননবোধ, সৃষ্টির প্রকৃত উদ্দেশ্য নিহিত থাকে। তাই সাহিত্যের ক্ষেত্রে নামকরণ নির্দেশাত্মক নয়, গুণাত্মক, কোন কোন ভারতীয় দর্শন একথাও বলে যে, যেখানে নাম ও নাম্নী অভিন্ন, সেখানেই নামকরণ তাৎপর্যপূর্ণ ও সার্থক। বস্তুত সাহিত্যজগতে এই অভিন্নতার আলোকেই নামকরণ দ্যুতিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

সাহিত্যে নামকরণের ক্ষেত্রে প্রধাণতঃ দুটি রীতি অবলম্বন করা হয়। প্রথমটি নামপ্রধান নামকরণ ও দ্বিতীয়টি ভাবপ্রধান নামকরণ বা ব্যঞ্জনাধর্মী নামকরণ। কাহিনি প্রধান সাহিত্যে, কাহিনির কেন্দ্র অবস্থিত চরিত্র, ঘটনা, স্থান যখন শিরোনামে প্রাধান্য পায়, তখন তাকে নামপ্রধান নামকরণ বলি। যেমন— বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এর 'দুর্গেশনন্দিনী', 'কপালকুন্ডলা', 'রজনী', ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'কঙ্কাবতী', রমেশচন্দ্র দত্তের 'মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত', 'রাজপুত জীবনসন্ধ্যা', যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর 'কালাচাদ', 'শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মী', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'যোগাযোগ', 'নৌকাডুবি', 'গোরা' ইত্যাদি। কাহিনীর মূল ভাবকে কেন্দ্র করে যখন কোনো সাহিত্যের শিরোনাম স্থির করা হয় অর্থাৎ সম্পূর্ণ বিষয়ভাবনার ব্যঞ্জিতরূপ শিরোনামে স্থান পায়, তখন তাকে বলা হয় ব্যঞ্জনাধর্মী নামকরণ। যেমন— বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বিষবৃক্ষ', রমেশচন্দ্র দত্তের 'সংসার', প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'জীবনের মূল্য', 'মনের মানুষ', শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পরিণীতা', 'চরিত্রহীন', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ঘরে বাইরে', 'চার অধ্যায়', 'শেষের কবিতা' ইত্যাদি। আলোচ্য মানিক বন্দ্যোপাধ্যয়ের অন্যতম উপন্যাস 'পুতুল নাচের ইতিকথা' (গ্রন্থাকারে প্রকাশিত ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দে, উপন্যাসটি ১৩৪১ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যা থেকে ১৩৪২ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ পর্যন্ত 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় মোট বারোটি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।) ভাবধর্মী বা ব্যঞ্জনাধর্মী নামকরণের অন্তর্গত; যদিও জীবনবোধের একটি দিক হল নিয়তিবাদ, তবু বলা যায় উক্ত উপন্যাসটির নামকরণ সম্পূর্ণ-ই মানব সম্পর্ক নিয়ন্ত্রিত।

পুতুলনাচ আমাদের দেশের প্রাচীন ঐতিহ্যপূর্ণ একটি লোকশিল্প। নির্বাক পুতুলগুলিকে মঞ্চের উপরে অদৃশ্য এক মানুষের হাত আড়ালে থেকে নাচায়; আর 'ইতিকথা' শব্দটি দুটি পৃথক শব্দের সংযোজনে সৃষ্টি। 'ইতি' অর্থাৎ 'সমাপ্ত' বা 'অবসান' এবং 'কথা' অর্থে 'কাহিনি'-কেই বোঝান হয়। 'পুতুলনাচের ইতিকথা' কি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেই শ্রেণীর নামকরণ, যা নিয়ন্ত্রিত মানবজীবনের অবসানজনিত কাহিনিকে ইঙ্গিতায়িত করেছে? মানুষের জীবন যেন পুতুলের নাচ, আমাদের জীবনরঙ্গমঞ্চেও আমরা একেকজন পুতুল মাত্র, যেন কোন অদৃশ্য শক্তির দুর্বোধ্য ইঙ্গি তে সমস্ত কর্ম সমাধা করে চলেছি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'পুতুল নাচের ইতিকথা' উপন্যাসে এই তত্ত্বকেই প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন কয়েকবার পুতুলের অনুসঙ্গকে উপন্যাসটির নানা পর্যায়ে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ব্যবহার করে। উপন্যাসের শেষে কুসুমের বাবা অনন্তের বিষন্ন উক্তিতে এই পুতুলনাচের রূপক ধর্ম ব্যঞ্জনায়- অনুভবে প্রকাশ ঘটেছে: 'সংসারে মানুষ চায় এক হয় আর, চিরকাল এমনি দেখে আসছি ডাক্তারবাবু। পুতুল বইতো নই আমরা, একজন আড়ালে বসে খেলাচ্ছেন।' অর্থাৎ মানুষ পুতুল, আর একজন আড়ালে বসে সংসারমঞ্চে মানুষরূপী এই পুতুলগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করছে। এই ভাবনা নিঃসন্দেহে শিরোনামের গূঢ়ার্থকে প্রকাশ করছে।

উপন্যাসের প্রারম্ভে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অত্যন্ত সুকৌশলে পুতুলের প্রসঙ্গ আনলেন। হারু ঘোষের মৃতদেহ গ্রামে প্রবেশ করছে, গ্রামীণ নিশুতি রাত্রে কর্দমাক্ত পথে চলেছে হারুর মৃতদেহ। পথের ধারে বকুলগাছের গোড়ায় বসে শশী বিশ্রাম নিচ্ছে, তখন তার দৃষ্টিগোচর হয় ন্যাকড়া-জড়ানো একটা পুতুল ঝরা-পাতার উপর পড়ে আছে। শ্রীনাথের মেয়ের পুতুল এটি। এই পুতুলটাকে দেখে শশী মনে করে, ভোরবেলায় বকুলতলায় ঝাড় দিতে এসে সেনদিদি পুতুলটাকে দেবতার ঈঙ্গিত মনে করে নিয়ে যাবে আর মেয়েটি না পাওয়ার হতাশায় কাঁদবে। এই ঈঙ্গি তময়তার টানাপোড়েন আর আশা-নিরাশা, হাসি-কান্নার ঈঙ্গিত ও হারানোর বৈপরীত্যের সমন্বয়েই উপন্যাসটির সূচনা হয়েছে।

সমগ্র উপন্যাস জুড়েই এই পুতুল প্রসঙ্গ বারংবার এসেছে। যাত্রাদলের সঙ্গে কুমুদ শশীর গ্রামে এলে, শশী বোনের প্রসঙ্গে কুমুদকে বলে, "আমার খাটের তলাটা হল ওর খেলার ঘর। তাকিয়ে দেখ, পুতুলেরা সার

সার ঘুমোচ্ছে। এবার ঘুম ভাঙবে খুকির আসবার সময় হল।" তাছাড়া শশী যখন বোনকে জিজ্ঞাসা করে যে, সে বড় হয়ে কী করবে। তার জবাবে সিন্ধু বলে: " 'পুতুল খেলব' এবং এই একটিমাত্র জবাবে ক্ষণেকের জন্য শশীর মন যেন একেবারে হালকা হইয়া যায়।" এর অব্যবহিত সময়েই যে শশীর মন ভারাক্রান্ত ছিল, পরমুহূর্তের সব কিছুকেই তার মনে হয়, পুতুল খেলার মতই পরিনামহীন লঘু ও নিরর্থক। এরই বিপরীতে দেখা যায়, মতি কলকাতায় কুমুদের সঙ্গে জমিয়ে বসেছে, তখন মতির মনে হয়েছে পুতুলের মত সাজানো সংসার, জয়া বালিকাবধূ মতিকে নেড়েচেড়ে দেখছে, আর সেই মুহূর্তেই কুমুদ বলে: "স্পীড একটু কমাও জয়া, ভড়কে যাবে। পুতুল তো নয়।" এদিকে শীতলবাবুর দুর্লভের মেলায় পুতুল নাচের আসর বসানোর প্রসঙ্গ উপন্যাসে এসেছে এবং উপন্যাসের অন্ত্যে শশী স্থির করেছে গ্রাম ছেড়ে দেবে। সব বুঝিয়ে দেয় অন্য জাক্তারকে কিন্তু গোপাল সেনদিদির ছেলেকে নিয়ে চলে যায়, শশী-বাধা পড়ে গ্রামে। সে পুতুলের মতো অচেতনভাবে ঘুমায়। যদিও সে জীবন সম্পর্কে সচেতন। এ প্রসঙ্গে উপন্যাসিকের মন্তব্য এক্ষেত্রে প্রনিধানযোগ্য: "জীবন সম্পর্কে যে অমন তীব্রভাবে সচেতন, সে হইয়া থাকে পুতুলের মত চেতনাহীন।"

পুতুলের প্রসঙ্গ উপন্যাসে ঘুরে-ফিরে আসলেও আমাদের মনে বারংবার মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনবোধ— দর্শন সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন উদয় হয়। মানিক কি সত্যিই মনে করেন মানুষ পুতুল? সে কি এরকম ভবিতব্য তাড়িত নিয়তির দ্বারা ভাগ্যাহত? আমরা ভুলে যাই না যে, মানিক ছিলেন বিজ্ঞানের ছাত্র। তাই বিজ্ঞান-মনস্ক মনের অধিকারী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কখনও ভাবতে পারেন না, মানুষ পুতুলের মতো সূতোর টানে নাচে কিংবা এক অদৃশ্য বা অলৌকিক শক্তির দ্বারা মানুষ চালিত। বকুলতলায় পুতুলদেখে শশী যে চিন্তা করেছিল তা সেনদিদির প্রতি শ্রদ্ধা-ভালোবাসা থেকে। এতে কোন অলৌকিক ভাবনা প্রশ্রয় পায়নি, সেনদিদি যেটা ভাবতে পারে, তাই শশী পূর্বরাত্রে ভেবেছে। এ এক জীবন সম্পর্কে সহানুভূতিশীল বিচার। এখানে অলৌকিকতা বা নিয়তির প্রভাব নেই। স্বাভাবিক ভাবনায় যা মনে আসতে পারে তাই শশী ভেবেছে। এমনকি কুমুদের সঙ্গে শশীর আলাপে নিয়তির কথা নেই। শশীর খুকির 'ঘুম ভাঙবে' এই মন্তব্যই প্রমাণ করে যে, মানুষ পুতুল নয়। কারণ, মানুষের ঘুম ভাঙে, পুতুলের নয়। কুমুদ, জয়ার কাছে মতিকে মানুষ হিসেবেই প্রতিপন্ন করতে চেয়েছে। মানুষ পুতুলের মত জড়বস্তু নয়। শশী একবার মন্তব্য করেছে: "তাকে একবার হাতে পেলে দেখে নিতাম।" 'তাকে' বলতে অদৃশ্য শক্তিকে বুঝিয়েছে। এই মন্তব্যের অদৃশ্য শক্তিকে অগ্রাহ্য করার ইঙ্গিত আছে। আসলে অলৌকিকত্বের যাবতীয় আয়োজন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই ভেঙে দিয়েছেন।

কিন্তু কেন তবে পুতুলের কথা বারংবার এ উপন্যাসে এসেছে ? মানুষ এ সংসার রঙ্গমঞ্চে পুতুলের মতো নাচে, ভাঙ্গে। তবে, পুতুল কে, আর পুতুল নাচিয়ে-ই বা কে? আসলে মানুষ-ই পুতুল। সে আপাদমস্তক সামাজিক। যে নৈরাশ্যতা মানুষকে ঘিরে ফেলেছে তার জন্য মানুষ-ই দায়ী। মানুষ নিজেই নিজেকে নিঃস্ফল ব্যর্থ করেছে। শশীর স্বপ্ন উপন্যাসের শেষে সফল হল না। সে নিজেই নিজেকে ব্যর্থ করেছে। গ্রামীণ জীবনের সঙ্গে একটু একটু করে শশী জড়িয়ে পড়েছে, কিন্তু তাকে ব্যর্থ করেছে তার পরিবেশ। তার পিতা গোপাল, সেই জীবন ছেড়ে চলে যায় অতৃপ্ত পিতৃত্বের বাসনায়। শশী ও গোপাল পরস্পর পরস্পরকে ব্যর্থ করে। কুসুমের প্রেমকে শশী ব্যর্থ করে আর শশীর জীবনকে শেষে কুসুম ব্যর্থ করে। উপন্যাসের সূচনাতে হারু ঘোষের পরিণতিতে মনে হয়, মানুষ নিয়তিতাড়িত, কিন্তু বজ্রপাত প্রকৃতির নিয়ম, নিয়তির এতে হাত নেই কোন। যেমন— মাধ্যাকর্ষণ এই মহাবিশ্বের পৃথিবীর মধ্যে থাকা একটি নিয়ম। সুতরাং উপন্যাসের সমস্ত চেষ্টায় যে ব্যর্থতা এসেছে, তাতে মানুষই দায়ী। আমরা নিজেরাই পরস্পরের সঙ্গে ভোজবাড়িও ম্যাজিক করে চলেছি। যে মানুষ বুদ্ধিতে-অর্থে-যশে সামান্যতম উপরে, সে অন্যকে ম্যাজিক বা ভোজবাজি দেখিয়ে অভিভূত করে দিতে চায়। মানব সমাজটাও ম্যাজিশিয়ানের মতো। পরস্পরকে সম্মোহিত ও দখল করতে চায়। তাই পুতুল বলতে

'মানুষ' আর তাই তার নড়াচড়াও অসংখ্য সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ। একজন নাচলে অন্যজনও নাচে বা নাচতে বাধ্য হয়। এতে হাসি-কান্না সব কিছুই বিফল হয়ে যায়। তবু মানুষ জেনেও এখেলা খেলে। পুতুলও নয়, নাচও নয়, মানিকের লক্ষ্য পুতুল নাচ। বলা বাহুল্য, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এই লক্ষ্য পূরণে সিদ্ধ হয়েছেন, সুতরাং সবদিক থেকে বিচার-বিশ্লেষণে বলা যায়, 'পুতুল নাচের ইতিকথা' উপন্যাসটির নামকরণ যথাযথ গভীর অর্থবহ ও ব্যঞ্জনাধর্মী হয়ে উঠেছে নিয়তি নিয়ন্ত্রণের জন্য নয়, মানব সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের সুবাদেই।

খ

প্রকৃতির সঙ্গে মানবাত্মার চিরন্তন সম্পর্ক বর্তমান, তাই আদিকাল থেকে মানব ও প্রকৃতির সুনিপুণ সাহচর্যে উদ্ভাসিত হয়েছে সৃষ্টির অন্তগূঢ় রহস্য। প্রকৃতি প্রেমিক সাহিত্যস্রষ্টার কলমে কিংবা দার্শনিক গণের স্থিতধী প্রজ্ঞায় তাই যুগে যুগে সুন্দরী প্রকৃতির রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শের উন্মাদনা চিরন্তন হয়েছে। William Wordsworth প্রকৃতিকে শিক্ষকরূপে গ্রহণ করার কথাই বলেছিলেন; কারণ, প্রকৃতির অনুমেয় উষ্ণতার সান্নিধ্যেই মানুষের চিন্তা-চেতনা-মননের বিকাশ ঘটে। আর দার্শনিক-মনোবিজ্ঞানী হিপোলাইট ধারণা করেছেন যে, মনকে আধ্যাত্মিক রহস্যময়তার মোড়কে বাঁধা বলে ধরা যায় না বরং মানতে হয় ইন্দ্রিয়ানুভূতির প্রভাব মনের উপর ক্রিয়াশীল। টেইলে ধারণা করেন যে, এই মহাবিশ্ব বস্তুত: একটি Great Mechanism. মানুষ, মানুষের নৈতিক জীবন এবং কর্মকান্ডসমূহ এসব কিছুই বোঝা যেতে পারে কার্য-কারণ সম্বন্ধসূত্রে। এখানে অলৌকিকতা বা অতিপ্রাকৃততার স্থান নেই। জীববিজ্ঞানী— দার্শনিক ডারউইন মনে করেন, মানুষ নিয়তির কাছে অসহায়। ব্যক্তি চরিত্রসমূহ Helpless products of Heredity and environ ment. জড় বিশ্বের ফাঁদে সে বন্দী। রক্তমাংসের দেহের কামনা, আকাঙ্ক্ষা ও তার জড়বিধান মানুষের জীবনে একমাত্র নিয়ন্ত্রণকারী শক্তি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এর কালজয়ী শ্রেষ্ঠ পুতুল নাচের 'ইতিকথা' উপন্যাসে প্রকৃতি-জৈবিকতার সম্পর্ককে এই দৃষ্টিকোণ থেকে সুস্পষ্টরূপে তুলে ধরতে পেরেছেন।

কথাসাহিত্যের প্রতিটি রচনা সাধারণ অর্থে ভূমিনির্ভর। কেমবমাত্র অবস্থানগত কারণে পটভূমির ভূমিকা ঔপন্যাসিককে তুলে ধরতে হয়। ফলতঃ পটভূমি ও তার জীবনধারা, নিসর্গ অনিবার্যভাবে উপন্যাসের চরিত্রগুলির ওপর ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করে। এই কারণেই মানবজীবন ও প্রকৃতি একে অপরের পরিপূরক হয়ে ওঠে। আলোচ্য উপন্যাসে প্রকৃতির অমোঘ প্রভাব মানুষের জৈবিক বাসনার সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে। উপন্যাসটির প্রতিটি চরিত্র-ঘটনা ও ঘটনার পারম্পর্যতা এক অদৃশ্য অন্ধনিয়তির পাশে বদ্ধ হয়ে ভাগ্য-নিয়ামক হয়ে উঠেছে, যেন রহস্যের অপার বিস্ময় শক্তি মানুষের কর্মের সঙ্গে সর্বদা যুঝে চলেছে। শশী, কুসুম, গোপাল, যাদব পন্ডিত, সেনদিদি, হারুঘোষ— এদের কারুর ইচ্ছাই শেষ পর্যন্ত পূর্ণ হয়নি। প্রত্যেকেই অপূর্ণ ইচ্ছের যন্ত্রণায় বিদ্ধ হয়েছে। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকৃতির মধ্যে দিয়ে মানুষের নিয়তিকে এভাবেই ফুটিয়ে তুলেছেন।

উপন্যাসটির স্থানিক পটভূমি গাওদিয়া গ্রামের জীবনযাত্রা পদ্ধতির মধ্যেই আবর্তিত। ঔপন্যাসিক, তাঁর জীবনদর্শনের আলোয় এই গ্রামের প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে দিয়ে এই উপন্যাসের চরিত্রগুলিকে ফুটিয়ে তুলেছেন। যদিও সম্পূর্ণভাবে গ্রামের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস এখানে নেই। ছোট ছোট চিত্ররচনার মধ্যে দিয়ে মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক তুলে ধরা হয়েছে। প্রাকৃতিক বর্ণনার মধ্যেই জীবনের জৈবিকতার রসায়ন পরিপুষ্ট।

উপন্যাসের সূচনায় দেখা যায়, প্রাকৃতিক দুর্বিপাকে হারু ঘোষের মৃত্যু ঘটেছে। তার মানসিক ইচ্ছার পরিপূর্ণতা ঘটে না। ঔপন্যাসিক বিবরণ দিয়েছেন এইভাবে: "খালের ধারে প্রকান্ড বটগাছটার গুঁড়িতে ঠেস দিয়া হারু ঘোষ দাঁড়াইয়া ছিল ... শতাব্দীর পুরাতন তরুটির মূক অবচেতনার সঙ্গে একান্ন বছরের আত্মময়তায়

গড়িয়া তোলা বিস্ময় জগৎটি তাহার চোখের পলকে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।" উপন্যাসের সূচনা এই নৈব্যক্তিক অসহায় মৃত্যুদৃশ্য দিয়ে অর্থাৎ প্রকৃতির অমোঘ নিয়তিই যেন রচিত হয়েছে উপন্যাস প্রারম্ভে। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসের অন্যতম সুর মৃত্যুচেতনা এক্ষেত্রে ধ্বনিত। মৃত্যুচেতনাকে বাদ দিয়ে জীবনচেতনা পূর্ণতা পায় না। এই উপন্যাসের অন্তিমে সেই জীবনচেতনার বাণী-ই উন্মোচিত হয়েছে প্রকৃতির-ই সাহচর্যে: "তালবনে শশী আর কখনো যায় না। মাটির টিলাটির উপর সূর্যাস্ত দেখিবার শখ এ জীবনে আর একবারও শশীর আসিবে না।" অর্থাৎ প্রকৃতির প্রেক্ষাপটে এই উপন্যাসের সূচনা ও অন্ত্য গ্রন্থিত। গ্রামের বিবরণ দিতে গিয়ে ঔপন্যাসিক প্রকৃতির প্রেক্ষাপটেই বর্ণনা টেনেছেন: "স্থানটিতে ওজনের ঝাঁঝালো সামুদ্রিক গন্ধ ক্রমে মিলাইয়া আসিল। অদূরের ঝোপটির ভিতর হইতে কেয়ার সুমিষ্ট গন্ধ ছড়াইয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। সবুজ রঙের সরু লিকলিকে একটা সাপ একটি কেয়াকে পাকে পাকে জড়াইয়া ধরিয়া আচ্ছন্ন হইয়া ছিল।" এর সঙ্গে হারুর মৃত্যু উপন্যাসের অন্তর্বিরোধকেই যেন ফুটিয়ে তোলে। একই সঙ্গে এই অংশে মৃত্যু ও জীবনের অন্বেষণ ঔপন্যাসিক ফুটিয়ে তুলেছেন সরীসৃপ, শেয়াল এসবও প্রাকৃতিক নিয়মে চলেছে।

মানুষের জীবনবৃত্তে আনন্দ দুঃখ, সুখ-যন্ত্রণা অনেক সময় প্রকৃতির প্রেক্ষাপটেও ঘটে থাকে। কখনও প্রকৃতি মানুষের জীবনে খুশীর স্বপ্ন আনে; আবার কখনো বিষণ্ণতার সুর অনুরনিত করে। এই উপন্যাসেও ঋতু পর্যায়ের বৈচিত্র্য তুলে ধরা হয়েছে। এই বৈচিত্র্যতা দেখা গেছে শশীর ডাক্তারী উপলব্ধির মধ্য দিয়ে এবং উপন্যাসের বর্ণনামূলক বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে। অথচ তা জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েই পরিবেশিত হয়েছে। বস্তুত: উপন্যাসটির কালক্রম এক বর্ষা থেকে পরবর্তী বর্ষা ঋতুতেই শেষ হয়েছে। আর ঋতুচক্রের ধ্রুবপদটিতে বিভিন্নভাবে উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে ঘটনার ঘনঘটা। শশীর দৃষ্টিতে প্রকৃতির নির্মোহভাবকে তুলে ধরা হয়েছে এভাবে: "এই সুদূর পল্লীতে হয়তো সে বসন্ত কখনো আসিবে না। যাহার কোকিল পিয়ানো, সুবাস এসেন্স, দখিনা ফ্যানের বাতাস। তবু শশীর মনকে কে বাঁধিয়া রাখিবে? ... আজ শশী কামিনী ঝোপের পাশে ক্যাম্প চেয়ারে বসিয়া বাঁশ ঝাড়ের পাতা কাঁপানো ডোবার গন্ধভরা ঝিরঝিরে বাতাসে উন্মনা হোক....." তালপুকুরের বর্ণনার মধ্য দিয়েও হৃদয়স্পর্শী প্রকৃতির বর্ণনা দিয়েছেন মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়। চরিত্রের ছোটখাটো মানসিকতা (অর্থাৎ Mood) গুলিকে এই তালপুকুরের বর্ণনার সাথে সাথে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের যেমন বিরোধ আছে, তেমনি বন্ধুত্বও আছে। পুতুলের মতো প্রকৃতিও এক্ষেত্রে প্রতীকি অর্থে গৃহীত হয়েছে: "সর্বাঙ্গের শুভ্রতায় তালগাছের রহস্যময় ছায়া মাখিয়া মাখিয়া তালপুকুরের গভীর কালো জলে হাস সাঁতার দেয়, তাদের গায়ে ঠেকিয়া লাল ও সাদা শাপলাগুলি জলে ডুবিয়া ভাসিয়া ওঠে।" মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বর্ণনার চিত্রকল্পের রূপ ফুটে ওঠে চতুর্দিকের ভরন্ত কলমীশাকের ফুলে, যেগুলি বাতাসের স্পর্শে অতীব সুন্দর রূপ পায়: "আকাশে ভাসে উজ্জ্বল সাদা মেঘ আর বন্য কপোতের ঝাঁক। শালিক পাখি উড়িবার সময় হঠাৎ শিস্ দেয়, অল্প দূরে পাখির পাঠশালা বসে। বাতাসে থাকে কত ফুল, কত মাটি, কত ডোবার মেশানো গন্ধ।" মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'পুতুল নাচের ইতিকথা' উপন্যাসে মতি-কুমুদের রোমান্টিক উপাখ্যানটিও প্রকৃতির সান্নিধ্যে স্থাপন করেছেন। কবি-কল্পনার আশ্রয়ে রোমান্টিক বর্ণনা যথেষ্ট মনোরম হয়েছে। আবার মতি ও কুমুদের চরিত্রকে ফুটিয়ে তোলার ক্ষেত্রে সাহায্য করেছে প্রকৃতি। শশী ও কুসুমের পারস্পরিক সম্পর্ক, আকর্ষণ-বিকর্ষণের ক্ষেত্রে, সূচনা থেকে শেষ পর্যন্ত তাদের নৈরাশ্য-পীড়িত বিদায়ের সাক্ষী-হিসেবে তালপুকুরের নিসর্গ প্রকৃতি–ই স্থান পেয়েছে।

সমগ্র উপন্যাসে, এভাবে টুকরো টুকরো জীবন সম্পর্কিত জৈবিক বাসনা সম্পর্কিত প্রকৃতি-চেতনা এসে ভিড় করেছে অবয়বে। যেমন মনের অস্থিরতায় এবং শশীর কাছ থেকে কোনরকম সাড়া না পাওয়ায় কুসুম গোলাপের চারা মাড়িয়ে দিয়েছে। আবার কখনো কুসুম, শশীকে বলেছে: "এমনি চাঁদনি রাতে আপনার সঙ্গে

কোথাও চলে যেতে সাধ হয় ছোটোবাবু।"— অর্থাৎ এই উপন্যাসের প্রকৃতি চিত্রণে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় জীবন ও জৈবিকতার সঙ্গে প্রকৃতির অন্বয় ঘটিয়েছেন। প্রকৃতি এখানে মানবজীবনের বিশেষ করে অবচেতন বেশ কিছু ভাবকে তুলে ধরার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছে।

গ

মানুষের ভাববিনিময়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ- সংবেদনশীল, আত্মিক মাধ্যম হল ভাষা। তাই স্রষ্টার কাছে সাহিত্যের ভাষা হল সেই মাধ্যম, যার তরী ধরে উপলব্ধির মোহনায় সহজেই পৌঁছানো যায়। উপন্যাসের ভাষা তাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, ঔপন্যাসিকের উদ্দেশ্য পূরণের মাধ্যম রূপে ভাষা তাই হয়ে উঠেছে আলোচ্য বিষয়। বিচিত্রধর্মী উপন্যাস রচনার সময় ভাবভঙ্গি ও পটভূমির বিভিন্নতা অক্ষুন্ন রাখতে তাই উপন্যাসিকগণ ভাষার উপরেই নির্ভর করেন। তাই প্রয়োজনের ভাষা হয় দৃঢ়-অন্বয় বন্ধনে সম্পৃক্ত, বর্ণনার ভাষা হয় কোমল-পেলব আর সৃষ্ট চরিত্রের ভাষা অনুভূতিবেদ্য রূপ পায়।

উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে পূর্ব-পরিকল্পিত নিটোল মুক্তঝরা প্লট বা কাহিনি যেমন ঘটনার দিক দিয়ে গঠন শৈলীর ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ, তেমনি দুরান্বয়ের আকাঙ্ক্ষাকেও ফলপ্রসূ করে তুলতে পারে একমাত্র ভাষা। উপন্যাসে তাই ভাষার ব্যবহার একাধিক ধরণের হয়ে থাকে। ভাষা যেখানে উপন্যাসের চরিত্রসৃষ্টির সহায়ক, বা পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যম, সেখানেও ভাষার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হয়ে থাকে। কল্লোলশ্রেষ্ঠ মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিরাসক্তি কেবলমাত্র বিষয়বস্তুর মধ্যে সীমায়িত নয়; তাঁর বর্ণনারীতির মধ্যেও বাস্তবতায় প্রখর রূপ লাভ করেছে। 'পুতুল নাচের ইতিকথা' উপন্যাসটি গাওদিয়া গ্রামজীবনের রাস্তব- পল্লী পরিবেশের সংকীর্ণ চৌহদ্দির মলিন, প্রাত্যহিক জীবনচর্চার প্রণালীর অল্পশিক্ষিত, অশিক্ষিত মানুষের জীবন-ভাবনায় আলোড়িত। শিক্ষিত শশী ডাক্তারের স্বপ্ন, সংঘাত, শেষে কীভাবে নৈব্যক্তিকতার স্তরে পৌঁছেছে— ঔপন্যাসিক যেন তারই ইঙ্গিত দিয়েছেন বারংবার। মানুষের ছকে বাঁধা জীবনের ইতিকথার ইতিবৃত্ত এ উপন্যাসে দ্বন্দ্ব–সংঘাতের মধ্যে দিয়ে রূপ পেয়েছে। এই সচেতন প্রখর মননবোধ থেকে জন্মলাভ করা উপন্যাসটির ভাষারীতি যে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ হবে- তাতে কোন দ্বিমত নেই।

'পুতুল নাচের ইতিকথা' উপন্যাসটিতে দুই ধরণের ভাষাকে ব্যবহার করেছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথমতঃ ওপন্যাসিকের নিজস্ব ভাষা এবং দ্বিতীয়ত: চরিত্রের মুখের সংলাপকে ঘিরে তৈরী হয়েছে যে ভাষা সাধারণ বর্ণনার ক্ষেত্রে তাই। নিসর্গ অঙ্কনের মাধ্যমরূপে, একাধিক চরিত্রের বর্ণনার ক্ষেত্রে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজস্ব ভাষাকে ব্যবহার করেছেন। উপন্যাসটি প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে 'সবুজপত্র' পত্রিকায় প্রমথ চৌধুরী চলিত রীতিকে প্রকাশ করেছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও 'চার অধ্যায়' উপন্যাসে সেই রীতিকে অনুবর্তন করেছিলেন, এঁদেরই সুযোগ্য উত্তরসূরী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁর উপন্যাসে সাধু ও চলিত ভাষার সংমিশ্রণে এক অদ্ভুত সাবলীল স্বচ্ছন্দ্য ভাষা সৃষ্টি করলেন 'পুতুল নাচের ইতিকথা' উপন্যাসটিতে, যেখানে শিথিলতার সঙ্গে স্বচ্ছন্দ্যতার সমন্বয় ঘটে গেছে। উপন্যাসের সূচনায়ই তার ইঙ্গিত সুস্পষ্ট: চন্ডীর মা মাঝে মাঝে দুপুরবেলা এদিকে কাঠ কুড়াইতে আসে। কিংবা "যামিনী কবিরাজের চেলা সপ্তাহে একদিন গুল্মলতা কুড়াইয়া লইয়া যায়।" এই বর্ণনার মধ্যে ভাষার কাঠামোগত রূপটি হয়েছে সাধু আবার সাধুর সাথে মেলবন্ধন ঘটেছে চলিত রীতিরও। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যখন লেখেন: "দু আঙ্গুলে একটি একটি মুড়ি মুখে দিবার সময় ছেলেকে তাহার কী সুন্দর দেখায়।" তখনও এই সাধু ও চলিত রীতি ভাষায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কেননা, সাধু শব্দ 'দুই'-এর চলিত রূপ 'দু'-এর সঙ্গে 'একটি একটি' সাধুরূপের মিশ্রণ ঘটে যায় মাত্র একটি বাক্যে। আবার বিবৃতিমূলক বর্ণনায় ঔপন্যাসিক স্বয়ং চলিত ও সাধুভাষা রীতির ব্যবহার করেছেন: "সকলে একদিন দুইদিন সহ্য করে, হাসিমুখে উঠিয়া বসিয়া হাই তুলিয়া বলাবলি করে: শশীর হয়েছে কী? এবার বাপু ওর একটা বিয়ে দেওয়া দরকার।"

এই ধরণের সাধু ও চলিত ভাষার সংমিশ্রণ উপন্যাসের একাধিক স্থানে রয়েছে।

উপন্যাসটির মধ্যে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় এমনভাবে সাধু ও চলিত রীতির সংমিশ্রণে ভাষারীতি গঠন করেছেন, তাতে বাক্যের স্বচ্ছন্দ্যতা কোন স্থানে বাঁধাপ্রাপ্ত হয়নি। প্রতিটি লাইনে কর্তা-কর্ম-ক্রিয়ার একটি নির্দিষ্ট সজ্জা বা বিন্যাস রয়েছে ভাষার অন্বয়বন্ধনে: "একটি অনাবশ্যক ব্যস্ততার সঙ্গে শশী ঘুরিয়া বেড়ায়- ওষুধের সঙ্গে দিয়েছে আশ্বাস।" এই বাক্যে ক্রিয়াপদটিকে মাঝখানে অবস্থান করিয়েছেন ঔপন্যাসিক। আবার ঔপন্যাসিক যখন লেখেন: "বাসুদেবের বাড়ি কম দূর নয়, শ্রীনাথের দোকান ছাড়াইয়া রজনী সরকারের পাকা দালানের পাশা দিয়া বামুনপাড়া পর্যন্ত গড়ানো সাপের মতো আঁকাবাকা পথের মাঝখান হইতে দক্ষিণ দিকে ঝোপঝাড়ের ভিতর দিয়া পায়ে চলা যে সংকীর্ণ রাস্তাটুকু পোয়াটেক গিয়া মাঠের মধ্যে হারাইয়া গিয়াছে, তার শেষাশেষি।"— তখন অসমাপিকা ক্রিয়া গিয়া' পরপর দুবার ব্যবহৃত হয়েছে জটিলবাক্য ব্যবহারের মাঝখানে। কখনও আবার তিনি অভিধানিক শব্দকেও পরিবর্তন করেছেন। যেমন আছ 'শব্দের অর্থ অতীতের সেই দিনটি'-কেই নির্দেশ করছে। 'খাপছাড়া', 'হারামজাদীর কান্ড দেখছ', '২৩ বছরের বাজা মেয়ে' ইত্যাদি অমার্জিত শব্দও অবলীলায় রূপ পেয়েছে এ উপন্যাসে। অর্থাৎ সংস্কৃত গন্ধী সাধুভাষা, তৎসম, চলিত, অশিষ্ট শব্দ সমন্বয়েই 'পুতুলনাচের ইতিকথা' উপন্যাসটি রূপ পেয়েছে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখনীতে ভাষা কখনো হয়েছে উদ্দেশ্যমূলকের হাতিয়ার। অর্থাৎ উপন্যাসের মূল বক্তব্যকে সফল করতে ভাষা ঔপন্যাসিকের শিল্পবোধের সহায়ক: "শনে ছাওয়া চাঁচের বেড়ায় গ্রামেরই চিরন্তন নিজস্ব নীড়।" এক্ষেত্রে 'নীড়' শব্দটি হয়েছে Focal Point. জন্মনাড়ীর সঙ্গে সংযুক্ত ও তার থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সন্ত্রাস বেদনাটি কাজ করেছে বলেই 'নীড়' হয়েছে শান্তির আশ্রয় স্থল। ঔপন্যাসিক তাই পরম মমতায় 'নীড়' শব্দটিকে একান্ত নিজস্ব, চিরন্তন ভাবনার সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন। শব্দটি ব্যঞ্জিত হয়েছে অতিযত্নে এ উপন্যাস অবয়বে: "সে তো ডাক্তার, আহত ও রুগের সঙ্গে তার সারাদিনের কারবার, দিন ভরিয়া তাহার শুধু মাটি ছোঁয়া বাস্তবতা,- শ্রান্ত মনে সন্ধ্যার জনহীন মন্দিরে বাসার মতো বুড়োবুড়ির এই নীড়ে সে শান্তি বোধ করে," "শশীর নীড় প্রেম সীমাহীন।" 'খাপছাড়া' শব্দটিও বারংবার ব্যবহৃত হয়েছে বাক্যে সংকীর্ণ জীবনের বিচ্ছিন্নতা বোঝাতেই। এ উপন্যাসের ভাষা মানিকের হাতে পড়ে কখনও শ্রুতিমধুর- পেলব রূপও ধারণ করেছে: "ডুরে শাড়ীটি পড়ে চুলটি বেঁধে বউটি সেজে বসেছিলাম।" হৃদয়মোত্থিত করা এ ভাষায় উপন্যাসিকের নস্ট্রালজিয়া ধরা পড়ে যায়।

সমগ্র উপন্যাসে বিষয়বস্তুর বর্ণনায়, গ্রাম ও গ্রাম পরিবেশের খন্ড চিত্র অঙ্কনে, চরিত্রে উক্তি- প্রত্যুক্তিতে ভাষা যেন প্রাণ সঞ্চার করে; সুন্দর, জটিল অথচ সাবলীল, মননবেদ্য হৃদয়স্পর্শী এ ভাষার মধ্যেই ফুটে উঠেছে নিরপেক্ষ ছন্দময় জীবনবিলাস। আটপৌরে অথচ ধ্বনিতরঙ্গময় এভাষা "ভাঙ্গা লণ্ঠনের রাঙা আলোতে মতির রং যেন মিশিয়া গিয়াছে," যেন অনায়াসেই পাঠকমনে স্থান পায়।

ঘ

বাংলা উপন্যাসে আধুনিক জটিল জীবনজিজ্ঞাসার বহমান ধারায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুতুল নাচের ইতিকথা' (১৯৩৬-এ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত) তরঙ্গপ্রপাত সৃষ্টি করেছিল— একথা নির্দ্বিধায় বলা চলে। ব্যক্তি জীবনের যন্ত্রণা-সংকট, জীবন মৃত্যুর দোলাচলে গড়ে ওঠা গভীর দার্শনিকবোধ, অনিঃশেষ জিজ্ঞাসা যেন মুক্তি পেয়েছিল এ উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে। অবশ্য ঔপন্যাসিক শশী চরিত্রের দর্শনেই তাঁর নিজস্ব জীবনবোধের প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। এই জীবনবোধের অন্যতম দিক নিয়তিবাদ, যা অদৃষ্টে থেকে মানবজীবনের চালিকাশক্তিরূপে নিয়োজিত রয়েছে। মানুষের সমস্ত কর্মপ্রচেষ্টার উৎসে রয়েছে তার নিয়তি বা অদৃষ্ট; তাকে

অতিক্রম করা যায় না। গ্রীক নিয়তিবাদে দেখা গেছে ভাগ্যেরই নির্মম পরিহাস আর পরবর্তীকালে মানুষ জেনেছে, কর্মবৃত্তির সত্যপ্রচেষ্টাই নিয়তি থেকে রক্ষা করতে পারে। অর্থাৎ মানুষ নিজেই অদৃষ্ট কর্মফল দ্বারাই রচনা করে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিজ্ঞানমনস্ক শিল্পভাবনায় কখনই সনাতন ধর্ম-সংস্কারের অদৃষ্টবাদ স্থান পায়নি। ভাগ্যের নির্মম হস্তে ক্রীড়নক মানব, মানবসংসারকে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় দেখেছেন পুতুল রূপে তাঁর 'পুতুলনাচের ইতিকথা' উপন্যাসে। তাই উপন্যাসের নামকরণের ক্ষেত্রেও ব্যঞ্জিত হয়েছে নিয়তিবাদের ধারণা। উপন্যাসটিতে নিয়তি যেমন মৃত্যুর বীভৎস করুণ দৃশ্যকে ব্যঞ্জিত করেছে, তেমনি শশীর ব্যক্তিগত জীবনে পরাজয়ের গ্লানিবোধকেও সূচিত করেছে। শশীর মনে জীবন সংক্রান্ত রহস্যবোধের প্রথম সূচনা হয়েছে একটি অপঘাতে মৃত্যুকে আশ্রয় করে: "খালের ধারে প্রকান্ড বটগাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়া হারু ঘোষ দাঁড়াইয়া ছিল। আকাশের দেবতা সেইখানে তাহার দিকে চাহিয়া কটাক্ষ করিলেন।" অর্থাৎ সূচনায় হারু ঘোষের মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে 'আকাশের দেবতা'-র অলক্ষ্য হাতে মানুষের অসহায়-নিরূপায় মৃত্যুর ছবির সাহায্যে পাঠকচিত্তে এক গূঢ় জীবনরহস্যের আভাস আনলেন। হারু ঘোষের নিরূপায় অসহায় মৃত্যু যেন গাওদিয়া গ্রামের 'ইতিকথা'র প্রবেশদ্বার হয়ে রইল। এই মৃত্যু অভিজ্ঞতায়ই সঙ্গী হল শশী। শশী শহরে বড় হওয়া ও স্বপ্ন দেখা চিকিৎসক বলেই মৃত্যুর নিষ্ঠুর গ্রাস থেকে জীবনকে ছিনিয়া আনার মন্ত্রে দীক্ষিত, সে ডাক্তার হয়েও এক্ষেত্রে জীবনকে রক্ষা করতে পারেনি। নিয়তির হাতে ক্রীড়নক শশী শুধুমাত্র শববাহকের সঙ্গী হয়েছে।

উপন্যাসের সূচনাতে মৃত্যুর অমোঘ রহস্য নিয়ে শশী গ্রাম জীবনে প্রবেশ করে, পল্লীর জীবনচিত্র অভিজ্ঞতার বিচিত্র ভান্ডারে পূর্ণ করেছে। তাই শশীর দৃষ্টি দর্পণে নানা রহস্যরূপ উদ্ভাসিত হয়েছে। সেইসব জীবন রহস্যচেতনার অন্যতম মুখ্য উপকরণ-মৃত্যু ও ব্যাধি। শুধু একটি মৃত্যু নয়, মানুষের চূড়ান্ত অসহায়তা, তার সমস্ত কর্মপ্রয়াসের চরম নিষ্ফলতা ও নিরর্থকতার মধ্যেই নিয়তির নীরব হাতছানি শশী লক্ষ্য করেছে বারংবার। বাসুদেব বাঁড়ুয্যের বালক- পুত্র, বৃদ্ধ যাবদপন্ডিত ও তাঁর স্ত্রী এবং যামিনী কবিরাজের স্ত্রী সেনাদিদির মৃত্যু- সবই একাধারে জীবনের অন্তহীন রহস্য ও মানুষের ব্যর্থতাবোধের নিরূপায় যন্ত্রনাকেই প্রকাশ করেছে। বজ্রাহত হারু ঘোষকে বাঁচানোর কোন সুযোগই পায়নি শশী ডাক্তার অথচ বাসুদেবের পুত্র ও সেনদিদিকে মৃত্যুর কবল থেকে বাঁচানোর জন্য যথাসাধ্য সংগ্রাম করেছে শশী; শেষ পর্যন্ত তাদের মৃত্যুই নিশ্চিত হয়েছে, শুধুমাত্র শশীর মনে নিয়তির অনুভব হয়েছে মাত্র: "শশীও ভাবিতে পারে নাই, এ যাত্রা সে রক্ষা পাইবে না। ডাক্তার মানুষ সে, সেও যেন ভালো করিয়া বুঝিতে পারিল না। ..... শশী জানে এরকম হয়, মানুষের দেহের মধ্যে আজও এমন কিছু ঘটিয়া চলে এ যুগের ধন্বন্তরিরও যা থাকে জ্ঞানবুদ্ধির অগোচরে।" বলা বাহুল্য, এই 'জ্ঞানবুদ্ধির অগোচরে'-ই রহস্যময় নিয়তির অবস্থান- একথা শশী নিশ্চিতরূপে বুঝতে পেরেছে।

শশী ডাক্তারের দৃষ্টিকোণে অপর একটি মৃত্যু রহস্যময় তাৎপর্যতা নিয়ে এসেছ; তা হল যাদব পন্ডিত ও তার সহধর্মিনীর মৃত্যু। এটি কোনো সাধারণ মৃত্যু নয়। গাওদিয়া গ্রামের প্রতিটি মানুষ জেনেছে এটি 'সিদ্ধপুরুষ' পন্ডিত মশায়ের 'ইচ্ছামৃত্যু'। কিন্তু চিকিৎসক শশী বুঝতে পেরেছে, এই মৃত্যুটি যাদব পন্ডিতের কোন অলৌকিক লীলা নয়, এর নেপথ্যে রয়েছে করুণ আত্মপ্রবঞ্চনা, অর্থাৎ নিরূপায় আত্মহত্যা। শশী বেশ ভালো ভাবেই বুঝতে পেরেছে: "আপিমের ক্রিয়ায় যাদবের চামড়া ঢাকিয়া চটচটে ঘাম। বিন্দুর মতো ছোট হইয়া আসা চোখের তারকা আর মুখে ফেনা উঠিবার কথা," তাই এই মর্মান্তিক ঘটনায় তার স্বীয় ভূমিকার অসহায়তা ও অর্থহীনতাও তার নিজের কাছে বড়ো নির্মমভাবে স্পষ্টে হয়ে উঠেছে। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মানুষটিকে বাঁচিয়ে তোলার সংগ্রামী ভূমিকা চিকিৎসক শশীর মনে বারংবার উদয় হওয়ার ফলে, শশীর নিজেকে বড় অসহায় লেগেছে। লেখক নিপুণ কৌশলে এমন এক পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছেন, যেখানে সব জেনে শুনেও শশীর ভূমিকা কেবল নিরূপায়

দর্শকের মতই হয়েছে। শশীর দৃষ্টির সামনেই দুটি প্রাণের শিখা ধীরে দীরে নিভে গেছে আর সেই সঙ্গে শশীর মনে প্রতিকূল নিষ্ঠুর এই জাগতিক পরিবেশে মানুষের কর্মপ্রয়াসের অর্থহীনতার চেতনা জেগে উঠেছে, যা প্রকারান্তরে নিয়তিবাদকেই সমর্থন করেছে।

'পুতুল নাচের ইতিকথা' উপন্যাসের সূচনায় মৃত্যুর মধ্যে দিয়েই নিয়তিবাদ সূচিত হয়েছে। এছাড়া, নেতিবাচক জীবনভঙ্গীর পরিচয়ের মধ্যে দিয়েও শশীর নিয়তিবাদকে সূচিত করেছেন ঔপন্যাসিক। চিকিৎসক শশী যেন সংশয়ে যন্ত্রনাবিদ্ধ এক অসুখী আত্মজিজ্ঞাসু সত্তা, যার ভাবনা-অনুভূতি পারিপার্শ্বিক দুশ্ছেদ্য জালে আবদ্ধ। তাই শশী বারংবার বাঁধা পেয়েছে তার স্বপ্নকে চরিতার্থ করতে গিয়ে, ফলে শেষ পর্যন্ত গ্রামীন জীবনের শিকড় ছেড়ে দূর আকাশে ডানা মেলতে গিয়েও বাঁধা পড়ে গেছে গাওদিয়ার জীবনচর্চায়। শশীর মনের এই আধুনিক যুগ দীনতা বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে দুই ব্যক্তির সংস্পর্শে-তাদের সঙ্গে শশীর পারস্পরিক ব্যক্তিগত গূঢ় সম্পর্কের মাধ্যমে। একজন শশীর পিতা গোপাল এবং অন্যজন কুসুম। উপন্যাসে শশীর সঙ্গে গোপালের সম্পর্ক সর্বদাই বিরোধ-সংঘাতের-এক মহাজন পিতার সঙ্গে আধুনিক প্রগতিশীল জীবনভাবনার অনুসারী পুত্রের। ওপরদিকে শশীর জটিলতম সত্তার উন্মোচন হয়েছে কুসুমের সঙ্গে তার সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে। উপন্যাসে কুসুমের প্রণয় ব্যাকুলতাকে সাড়া দেয়নি শশী। শশীর শিক্ষা-সংস্কার-মনোভাব-ব্যক্তিত্বের মর্যাদাবোধ তাকে বাঁধা দিয়েছে। অর্থাৎ শশীর ব্যক্তিসত্তার আত্মিক মৃত্যু ঘটেছে এক অমোঘ নিয়তির হাতে।

নিয়তিবাদের অপর তাৎপর্যতা ধরা পড়েছে জীবনের পরাজয়ে। যাদব পন্ডিত ও সেনদিদিকে বাঁচাতে না পারা, বিন্ধুর জীবন পরিণাম, পিতা গোপালের সঙ্গে নেতিবাচক সম্পর্ক, গ্রাম ছেড়ে শহরে গিয়ে স্বপ্নপূরণের ব্যর্থতা ও সর্বোপরি কুসুমের অপ্রত্যাশিত চলে যাওয়া— সমস্ত ঘটনাই পরিনামী ব্যর্থতা বহন করেছে শশীর জীবনে, ফলে তার জীবনও বিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে। অর্থাৎ আনিকেত, বিচ্ছিন্ন, নিঃসঙ্গ শশী জীবনের এক ব্যর্থতার মুহূর্তে উপলব্ধি করেছে: "একটা অদৃশ্য শক্তি যেন অহরহ তার বিরুদ্ধে কান্না করিতেছে।" এই দুর্বার শক্তির ইঙ্গিত ঔপন্যাসিক দিলেও স্পষ্টতা দেননি; বলা বাহুল্য-এটি-ই শশীর অমোঘ নিয়তি।

শুধুমাত্র কয়েকটি আকস্মিক ঘটনা বা শশীর ব্যক্তিগত জীবনবীক্ষাই নয়, উপন্যাসটির নামকরণেও নিয়তিবাদকেই প্রাধান্য দেন ঔপন্যাসিক। মানুষের জীবন যেন পুতুলের নাচ আর সংসার রঙ্গমঞ্চ। এক দুর্বোধ্য-অদৃশ্য নিয়তির (শক্তির) ইঙ্গিতেই আমাদের সমস্তরকম কর্ম সাধিত হচ্ছে। অর্থাৎ উপন্যাসটির নামকরণের চিত্রকল্পটিও পুতুলনাচেরই পটভূমি। তাই উপন্যাসে শশীর সমস্ত ধারনাই পরিনামহীন লঘু ও নিরর্থক- এই অদৃষ্টের হাতে মানুষ ক্রীড়ানক, ধারণাটিই নিয়তিবাদের মূলকথা। তাই সমস্ত ঘটনা চরিত্র ও সর্বোপরি নামকরণেও ব্যঞ্জিত হয়েছে অদৃষ্টের অদৃশ্য ক্রীড়ানৈপুণ্য। এখানেই উপন্যাসের নিয়তিবাদের উপর মানুষের কর্ম-স্বপ্নের প্রতিষ্ঠা।

ঙ

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বিংশ শতকের তিরিশের দশকে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব থেকেই উপন্যাস গল্প রচনা শুরু করেছিলেন। এ সময়ের পূর্বে ইউরোপে ফ্রয়েড, এড্‌লার, ইয়ুও প্রমুখের গবেষণায় ব্যক্তির মনোলোকের রসও উদঘাটিত হতে থাকে। ১৮৯৫ খ্রিষ্টাব্দে 'সাইকোএ্যানালাইসিস' (Psycho-analysis) নামক গবেষণা গ্রন্থ প্রকাশের ফলে মানুষের মন সম্পর্কে প্রচলিত ধারণার পরিবর্তন ঘটে। মানুষের মনের গহনে আবিস্কৃত হল ত্রয়ীস্তর- Ego, Id ও super Ego. ফ্রয়েড দেখালেন, ব্যক্তির সব অভিজ্ঞতা অবচেতনে (Sub-conscious) জমা হয়ে থাকে, তাদের মধ্যে কতগুলি বেদনাদায়ক বা কষ্ট-যন্ত্রণা উদ্রেককারী বলে এবং তা যৌনকামনার সঙ্গে জড়িত বলে একটি শক্তি তাদের চেপে থাকে। চেতন মনস্তরে (Conscious) উঠতে পারে না। এ শক্তির নাম অবদমন (Repression), দীর্ঘদিন অবদমনের ক্রিয়া চললে নানাবিধ মানসিক জটের (Complex) সৃষ্টি

হয়। কখনও কখনও হিসটিরিয়া, নিউরোসিস প্রভৃতি মানসিক রোগের মধ্যে তা আত্মপ্রকাশ করে। ফ্রয়েডের মতে, অবদমিত যৌন কামনা স্বপ্নের মধ্যে প্রতীকের রূপ নিয়ে দেখা দেয়। আপাত দৃষ্টিতে সেই চিত্রকল্প অর্থহীন হলেও তা অবচেতনের ভাষা।

বাংলা উপন্যাসে ব্যক্তিচরিত্রের মনস্তত্ত্বের আরোপ তিরিশের দশক থেকেই লক্ষ্য করা যায়। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় যার পথিকৃৎ। ফ্রায়েড পন্থী মনোবিকলন ও মনবিকারতথ্য, তাঁর প্রথম পর্যায়ের উপন্যাস 'দিবারাত্রির কাব্য' (১৯৩৫) 'পুতুল নাচের ইতিকথা' (১৯৩৬), 'পদ্মানদীর মাঝি' (১৯৩৬)-এ গভীর প্রভাব ফেলেছে। এই উপন্যাসগুলিতে ফ্রায়ডের যৌন মনস্তত্ত্ব দেখা দিয়েছে। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় যখন উপন্যাস রচনায় হাত দিয়েছেন, ঠিক তার পূর্বেই 'কল্লোল' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে উপন্যাস এক নতুন পথ নিয়েছে, যার প্রধান লক্ষ্যই হল নরনারীর প্রেম, যৌনজীবনচিত্র ও সমস্যাকে তুলে ধরা। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রবোধ স্যানাল, শৈলজানন্দ প্রমুখের উপন্যাসে নর-নারীর সেই দেহজ প্রেম ও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এক নতুন পথ অন্বেষণ করে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ও, তাঁর কালজয়ী উপন্যাস আলোচ্য 'পুতুল নাচের উপকথা' য়, ব্যক্তির মনোলোককে উদ্ঘাটন করে, তার কামনা-বাসনা দগ্ধ নির্যাসকেই সূক্ষ্ম ভাবরসে জারিত করে পাঠকবর্গকে উপহার দিয়েছেন।

'পুতুল নাচের ইতিকথা' উপকথার সূচনা প্রকৃতির রুদ্ররোষে হারুঘোষের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে। তার মৃত্যু উপন্যাসের নায়ক শশীকে প্রবলভাবে নাড়া দেয়। মৃত্যু এক একজনকে এক একভাবে বিচলিত করে। আত্মীয় কিংবা পরের মৃত্যুতে 'মরমানবের' জন্য শোক করে, শশী তাদের মতন নয়। তবু মৃত্যুর সান্নিধ্য যে শশীকে ব্যাথিত করে, উপন্যাসিক তা জানাতে ভোলেন নি। শশীর চরিত্রের দুটি সুস্পষ্ট ভাগের পরিচয় পাই। একদিকে তার মধ্যে কল্পনা, ভাবাবেগ ও রসোবোধের অভাব নেই, অন্যদিকে সাধারন সাংসারিক বুদ্ধি ও ধনসম্ভোগের প্রতি তার মমতা যথেষ্ট। এ হেন শশীর সঙ্গে পরানের বউ কুসুমের একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সম্পর্কের গোড়াতেই কুসুমের চলনে-বলনে-আচরণে ফ্রয়েডীয় যৌন মনস্তত্ত্ব নিঃসন্দেহে কাজ করেছে। মতিকে পরীক্ষা করে ডাক্তার শশী চলে গেলে বেগুনক্ষেতে দাঁড়িয়ে কুসুম হাসে। চাঁদ উঠলে কিংবা চাঁদ ওঠার আভাস দেখলে কুসুম যেন শুনতে পায়: "ভিনদেশী পুরুষ দেখি চাঁদের মতন/ লাজরক্ত হইয়া কন্যার পরথম্ যৌবন।" বাংলা কথাসাহিত্যে সধবা রমনীর প্রণয় ব্যাকুল চিত্র পূর্বে আসেনি— এমন বলা যাবে না; কিন্তু পাশ্চাত্যের সাইকোএ্যানালিসিস্টদের দৃষ্টিকোণ থেকে এমনভাবে চরিত্র সৃজন আমরা কুসুমের আগে দেখিনি।

প্রতিমামুখি মতির জন্য নয়, কুসুমের জন্য শশীর মনে নানা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। পরানের কথা শুনতে শুনতে শশী আশা করে, ঘরের ভিতর থেকে হয়ত দু'চোখে গাঢ় স্তিমিত ছায়া সঞ্চার করে হঠাৎ কুসুম বের হয়ে আসবে, আসলে উপন্যাসের কাহিনীকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বাইরের জগৎ থেকে মনোজগতে নিয়ে আসার পরিকল্পনা করেছিলেন আর সে কাজে শক্তি সঞ্চার করেছে সেনদিদি, যামিনী কবিরাজ, বিন্দু প্রমুখ। মতির মনে অবদমিত ভালোবাসা থেকে মতি ভাবছিল যে, বড়লোকের বাড়িতে শশীর মত স্বামীর সঙ্গে তার বিয়ে হোক, তাই সে স্বপ্ন দেখে: "মস্ত একটি ঘরের এক কোনে সে বসিয়া আছে। সর্বাঙ্গে তার ঝলমলে গহনা, পরনে ঝকঝকে শাড়ি।" কুসুম, শশীর কথা বলে মতিকে যেমন উত্তেজিত করে তোলে, তেমনি মতির প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে তাকে আঘাত করতেও ছাড়ে না: "এত বড় ধেড়ি মেয়ে তুই, লজ্জা নেই তোর পেটে ভাত জোটে না। ..... ছোট বাবু ? তুলনায় তুই ছোটলোক ছাড়া কি?" এই চেতন-অবচেতন মনের দ্বন্দ্বই ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বের মূল কথা, যে দ্বন্দ্ব শশী কুসমের মধ্যে যেমন বিদ্যমান, তেমনি পার্শ্ব চরিত্রগুলিকেও তা স্পর্শ করেছে।

কুসুমের মধ্যে এক ধরনের পাগলামি আছে, পাগলামির জন্যই তার প্রতি শশী আকৃষ্ট হয়। বাগানে শশীর সাধের গোলাপ চারাটি কুসুম দু'পায় মাড়িয়ে মাটিতে পুঁতে দিলেও শশী ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে না বরং কুসুমের মধ্যে

আবিষ্কার করে এক বালিকসুলভ সরলতা ও নির্বুদ্ধিতা। আবার মতির জন্য শশীর মনে বাৎসল্য মেশানো এক আশ্চর্য মমতা আছে। এই মমতার জন্যই মতির সঙ্গে কুমুদের বিয়ের কথা শুনে শশীর রাতে ঘুম হয় না। কুসুমকে সে বলে: "আমি যদি মতিকে বিয়ে করি?" এখানেই সমগ্র উপন্যাসটির মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষন Climax এর পর্যায় পৌঁছে গেছে। এ এমন এক প্রশ্নচিহ্ন যার ফলে কুসুম আরও বেশী শশীর ঘনিষ্ট হয়ে যায়— সম্ভবত নারীর অহংকার-ই এর মূলে থাকে। ফ্রায়োডীয় মনস্তত্ত্বে প্রেম বলতে দেহজ কামনা বাসনা জর্জরিত, প্রবৃত্তিজাত প্রেমই বোঝায়। দেহাধীন প্রেম-ই সেখানে মূল কথা। দেহাতীত প্রেমের অস্তিত্বকে ফ্রয়েড স্বীকার করেন নি। 'পুতুল নাচের ইতিকথা' উপন্যাসে সুক্ষ্মভাবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এই ফ্রয়েডীয়তত্ত্বকে সুচারুরূপে প্রয়োগ করেছেন। কুসুম একদিন শশীকে বলে— "এমনি চাঁদনী রাতে আপনার সঙ্গে কোথাও চলে যেতে সাধ হয় ছোটবাবু।" শশী কুসুমের এই ভাবনাকে মেনে নিতে পারেন না। আসলে, শশী নারীর মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে খুব বেশী ওয়াকিবহাল নন। উপযুক্ত পরিবেশে নির্জনে একাকী শশীকে পেয়ে— "কুসুম নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, আপনার কাছে দাঁড়ালে আমার শরীর এমন করে কেন ছোটবাবু?" তখন কুসুমের শরীর কথা বলতে চায়। কিন্তু বিপরীত দিক থেকে সাড়া না পেয়ে কুসুম হয়ত হতাশ হয়। অনুশোচনার আগুনে দগ্ধ হয়। শশী কুসুমের এই তীব্র কামনার আগুনের তাপকে বুঝতে না পেরে প্রশ্ন করে— "শরীর, তোমার মন নাই কুসুম?" এখানে শশীর মনের গহন কোনের আবেগ এক স্থায়ী রূপ নেয়, কিন্তু বিস্ময়কর ভাষার সাহায্যে ঔপন্যাসিক এখানে এক হিমশীতল পরিবেশের সৃষ্টি করেছে।

কুসুম তার শরীর-যৌবন-কামনা-বাসনা নিয়ে শশীকে আহ্বান করেছিল। শশী সেই আহ্বানের তাগিদ অনুভব করেনি বলেই সাড়া দেয়নি। ফলে অতৃপ্তির বেদনায়, অপ্রাপ্তির হতাশায় কুসুমের মনের উত্তাপ নষ্ট হয়ে যায়। তার জীবনে প্রাণের চাঞ্চল্য, কামনা-উন্মাদনার অপমৃত্যু ঘটে। তাই শশী কুসুমের হাত ধরে টানাটানি করলে কুসুম নিরাসক্ত ভাবে বলে— "কাকে ডাকছেন ছোটবাবু, কে যাবে আপনার সঙ্গে? কুসুম কি বেঁচে আছে? সে মরে গেছে।" এখানে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ফ্রয়েডের মনোবিকলন তত্ত্বকে, ক্ষতের বেদনার মতন ছড়িয়ে দেবার ক্ষমতা দেখিয়েছেন। এই তত্ত্বকে সাহিত্যের রসদ করে তুলতে বলা যায় তিনিই শ্রেষ্ঠ পথপ্রদর্শক। অদ্ভুত নিরাসক্তভাবে তিনি এই উপন্যাসে মানুষের কাম-পিপাসার জান্তবমূর্তি অঙ্কন করলেন। তিনি দেখালেন, মানবমন যুক্তির দাসত্ব করে, না বরং অন্তবস্থিত যৌন চেতনার, অদৃশ্য নিয়ন্ত্রণের অধীন। তবে অবৈধ প্রেমের যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করার সচেতন প্রচেষ্টা তিনি করেন নি, তার রহস্য উন্মোচনের প্রতি-ই দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছেন।

চ

সাধারণ ভাবে যে মূল কাহিনি ও শাখাকাহিনির সংমিশ্রনে একটি উপন্যাস কলেবর গঠিত হতে দেখা যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর পুতুল নাচের ইতিকথা (১৯৩৬) তার ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত। কারণ, এখানে মূল আখ্যান বলে কোনো আখ্যান নেই, কেবলমাত্র বেশ কিছু শাখা উপ্যাখ্যান অভিনব ও স্বতন্ত্র পদ্ধতিতে উপন্যাস কলেবরে স্থান পেয়েছে। উপন্যাসটির মূল কাহিনি না থাকলেও শশী নামে মূল চরিত্রটির চলমান জীবনপথে ও ব্যক্তিমনের ভাবনার বিভিন্ন স্তরে কুসুম নামক একটি নারী চরিত্র আত্মপ্রকাশ করেছে। তাই উপন্যাসটিতে শশী কুসুম সম্পর্কটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হয়েছে।

উপন্যাসটিতে শশী চরিত্রের প্রতি ঔপন্যাসিকের গভীর মনোযোগ লক্ষ করা যায় বলে, শশীর স্বভাবের বিশেষ বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনার সূত্রেই কুসুম চরিত্রটিকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ মমতা দিয়ে এঁকেছেন। আর এই শশীর প্রতি কুসুমের প্রেমও শেষপর্যন্ত বিচ্ছেদ পরিণতির মধ্যে দিয়ে রচিত হয়েছে। কুসুমের পেলব ও

অনুভূতিশীল মনকে শশী বুঝে উঠতে পারে নি। কেননা, স্ববিরোধের মধ্যেই কুসুমের স্বাতন্ত্র্যতা, কল্পনা আর বাস্তবের সংঘাতে কুসুম বদলে যায়, আর এই কুসুমও যখন শশীকে বলে— "চিরদিন কি আর একরকম যায়। মানুষ কি লোহার গড়া, যে চিরকাল সে একরকম থাকবে, বদলাবে না?" তখন জীবনের প্রবাহমানতায় কুসুমের মনস্তত্ব ধরা পড়ে। তারপর, গাওদিয়া ছেড়ে স্বামী পরানকে নিয়ে কুসুম চলে যায়! অথচ এই কুসুমই একদিন শশীকে নিয়ে ঘর করার স্বপ্ন দেখত— "এমনই চাঁদনীরাতে আপনার সঙ্গে কোথাও চলে যেতে সাধ হয় ছোটবাবু।" কিংবা এমন ছিল যে— "স্পষ্ট করে ডাকা দূরে থাক, ইশারা করে ডাকলে ছুটে যেতাম।" আর সেই কুসুমই আজকে অনেক পরিবর্তনশীল। শশীর সঙ্গে কুসুমের যে সম্পর্ক একদা গাওদিয়া গ্রামে থাকাকালীন রচিত হয়েছিল, সেই কুসুমই যেন আজ হারিয়ে গেছে আর কুসুমের এই অমোঘ ট্র্যাজেডি উপলব্ধি করেই, এই বেঁচে মরে থাকার মতো ভাবনা শশীকে এক নতুন উপলব্ধির জগতে এনে দেয়।

উপন্যাসে কুসুমের ব্যক্তিসত্তার ইচ্ছা অনিচ্ছা, রাগ-ক্ষোভ-প্রেম-বেদনার অকপট আত্ম বিশ্লেষণ, প্রেমকে জীবনের বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে যথার্থরূপে অঙ্কন করাই ছিল ঔপন্যাসিকের উদ্দেশ্য; তাই তো কুসুম তার আবেগ-ইচ্ছা, যন্ত্রণা ও তীব্র আকাঙ্ক্ষা নিয়েই শশীর সামনে বারংবার এসে দাঁড়িয়ে আরও স্পষ্ট করে, সে শশীকে তার ইচ্ছা ঘোষনা করে বলতে পেরেছে— "আপনার কাছে দাঁড়ালে আমার শরীর এমন করে কেন ছোটবাবু?" কুসুম তার সততা নিয়েই শশীর সঙ্গে দেহনির্ভর প্রেম কে স্বীকার করে নিয়েছে। তাই সে তার পরিবেশ, প্রকৃতি ও জীবনধারার সঙ্গে অঙ্গীভূত যন্ত্রণাময় শরীরী প্রেমকেই স্বীকার করেছে। বদলে পেয়েছে শশীর ঔদাসীন্য— "তুমিও রইলে, আমিও রইলাম।"— এই গতানুগতিক মনোভাব বছরের পর বছর ধরে কুসুমের প্রেমকে নিঃশেষ করে দিয়েছে, আর তাই কুসুম যখন শশীকে বলেছে যে, রক্তিম- জ্বলন্ত উত্তপ্ত পিন্ড (অবশ্যই লোহার) যেমন পরিবেশ-পরিস্থিতি ও দীর্ঘদিনের অবহেলায় শীতল হয়ে যায়। তেমনি শশীর প্রতি ও কুসুমের সম্পর্ক আজ ঝরে গেছে, তাই তো শশী অনুভব করেছে— "কুসুমকে আর কোনোদিন যে ভালোবাসতেই পারবে না, কষ্টে শশী ছট্‌ফট্ করে। ফুটিয়া ঝরিয়া গিয়াছে, কুসুম মরিয়া গিয়াছে, তারই চোখের সামনে, তারই অনমনস্ক মনের প্রান্তে।"

কুসুমের সঙ্গে শশীর এমন সম্পর্ক সৃষ্টি করেছেন ঔপন্যাসিক, যেখানে শশীর মনের আকাশে নীড়-প্রেম-সীমাহীন কল্পনার নারী হয়ে ধরা দেয়নি কুসুম, ধরা দিতে চায়ও নি। কেবল গাউদিয়ার মৃত্তিকা ঘনিষ্ঠ বাস্তবের ভূমিতেই সৃষ্ট এক স্বতন্ত্র্য চরিত্র, প্রেমপ্রতিমা কুসুম, তাই তার প্রতি শশী যখন মুগ্ধ হয়ে, কুসুমের অফুরন্ত জীবন শক্তিতে আকর্ষিত হয়ে ক্রমে ক্রমে গাউদিয়ার মাটিতে এক ভিন্ন আকর্ষণ রয়ে গেছে, তখন শশী কিন্তু নিজের চারিদিকে শিক্ষা সভ্যতার মোড়কটি সযত্নে বজায় রেখেছে। তাই সেই মোড়কে ফাটল ধরিয়ে পরিপূর্ণ আশ্রয় দেওয়ার সাহস, জীবনশক্তি ও সুতীব্র কামনা- রক্তিম প্রেম নিয়ে কুসুম শশীর জীবনে প্রবেশ করে, পরকীয়া প্রেমভাবনায় এক নতুন মাত্রা সৃষ্টি করেছে।

শশী ক্রমশই যখন কুসুমের সঙ্গে ঘনিষ্ট হয়ে পড়েছে, বুদ্ধিমতি কুসুমের নিখুঁত মনটার সন্ধান পেয়েছে, তখন শশীর কাছে নিজের ভালোবাসার অধিকার কায়েমি করার জন্যই অকপটে কুসুম স্বীকার করেছে, শশীর সাথে চাঁদনী রাতে হারিয়ে যাওয়ার ইপ্সিত মনোবাসনাটি। তাই আকারে, ইঙ্গিতে-ইশারায় রহস্যময়ী কুসুম, শশীকে ভালোবাসার টানে ভাসাতে চেয়েছে দীর্ঘ নয় বছর ধরে আর তাই শিক্ষিত শশী রোমান্টিক কল্পনা দিয়ে তখনও স্বপ্ন দেখেছে— "একদিন কেয়ারী করা ফুল বাগানের মাঝখানে বসানো লাল টাইলে ছাওয়া বাংলোয় শশী-খাঁচার মধ্যে কেনারি পাখির নাচ দেখিবে, দামী ব্লাউজে ঢাকা বুকখানা শশীর বুকের কাছে স্পন্দিত হইবে আলো-গান- হাসি- আনন্দ-আভিজাত্য কিসের অভাব তখন থাকিবে শশীর?" কুসুম-শশীর এই আভিজাত্য ঘেরা স্বপ্নটি নষ্ট করে দিয়ে বারংবার শশীকে বাস্তব মাটির, সজীব প্রেমে ভাসাতে চেয়েছে, শশীর কামনাকে মাতাল

করে দিয়েছে বলে শশী, কুসুমকে প্রশ্ন করেছে— "তোমার মন নাই কুসুম?" রহস্যময়ী শরীরী-প্রেমিকা কুসুম উপন্যাসের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ থেকে ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে বারংবার শশীর কাছে এসে দাঁড়িয়েছে সজীব কামনা নিয়ে আর তাই ভালোবাসার তীব্রতায় কুসুম অবৈধ অসামাজিক প্রেমের শর্ত ভুলে বারংবার ছুটে গেছে শশীর উষ্ণতা পেতে। তাই গ্রামের প্রান্তে তালবনে প্রেমের স্বর্গ রচনা করেছে অথচ শশী, কুসুমের মতো অসংকোচ- ভালোবাসা প্রকাশ করতে পারে নি। নাগরিক জীবন থেকে অর্জিত রোমান্টিকতা, শিক্ষা, আভিজাত্য ও পরস্ত্রী, বিশেষত বন্ধু পরাণের প্রতি আনুগত্য ও মধ্যবিত্ত সংস্কারের বশবর্তী হয়ে। তাই একদিন শশী- কুসুমের সম্পর্ক ম্লান হয়ে গেছে, শশীর কাছে সংসারের সবাই 'পুতুল' মনে হয়েছে, কুসুমের তপ্ত কাঞ্চন, দীপ্ত প্রেম অনাদারে-অবহেলায় ফিকে হয়ে গেছে। ফলে, হঠাৎ-ই শশী উপলব্ধি করেছে, কুসুম তার জীবনে অনিবার্য হয়ে উঠেছে। কুসুমের চলে যাওয়ার মুহূর্তে তাই অসীম আকুলতায় সে শশীকে জানিয়েছে— "কাকে ডাকছেন ছোটবাবু, কে যাবে আপনার সঙ্গে? কুসুম কি বেঁচে আছে? সে মরে গেছে।" তাই শশী-কুসুমের সম্পর্ক শেষ পর্যন্ত ইচ্ছা-অনিচ্ছায় আবদ্ধ না হয়ে বেঁচে রয়েছে। অনন্তর মেয়ে, পরানের বউ কুসুম সজীব প্রেম- ভলোবাসায় একদিন শশীকে ভাবিয়েছে কিন্তু জৈব-প্রেম শেষপর্যন্ত দুনির্বার বাসনায় পরিণত না হয়ে বিরহের কাজল দিঘির কমল হয়েই রয়েছে।

জৈব প্রেমে উজ্জ্বল প্রাণবন্ত হয়েও, কুসুম-শশীর সম্পর্ক অসার্থক হয়ে গেল আর তাই চিরকালের মত গাউদিয়া গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়াকে শ্রেয় মনে করে কুসুম, ভিনদেশী পুরুষের প্রতি লজ্জাতুর প্রেমকে উপবাসী রেখে চলে গেছে। শশী-কুসুমের সম্পর্ক তাই উপন্যাসে ভিন্ন স্বাদ এনে দিয়েছে।

ছ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'চোখের বালি', 'চতুরঙ্গ' ইত্যাদি উপন্যাসের পর থেকে বাংলা উপন্যাসের নির্মাণ কৌশলগত দিক থেকে এক অভাবনীয় পরিবর্তন দেখা গিয়েছিল, যেখানে কোনো নিরলস ঘটনা-বর্ণনার থেকে বিভিন্ন চরিত্রের জটিল মনস্তত্ত্বের ঘাত-প্রতিঘাত-এ গড়ে ওঠা আখ্যান বস্তুটিতে ঔপন্যাসিকের চিন্তা-চেতনার পাশাপাশি বিচিত্র প্রক্রিয়াও রূপ পেয়েছিল। এই কৌশলটি বিংশ শতাব্দীর তিনের দশকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সুন্দর রপ্ত করেছিলেন, তাঁর 'পুতুল নাচের ইতিকথা' ঔপন্যাসটিতে শশী-গোপাল অর্থাৎপুত্র ও পিতার মধ্যে সংঘাতকে উপলব্ধি করেই পাঠকমহল তা বুঝতে পারে।

উপন্যাসের গোপাল ও শশীর মধ্যে পিতা-পুত্রের সম্পর্ক বর্তমান। এদের দুজনের মধ্যেই রয়েছে পরস্পর বিপরীত সত্তা। গোপালের মধ্যে রয়েছে নিজ গ্রামের মধ্যে আর্থিক ও সামাজিক দিক থেকে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার প্রবল বাসনা। পাশাপাশি রয়েছে পুত্রের প্রতি গভীর মমতাবোধ। পক্ষান্তরে, শশীর মধ্যে রয়েছে নিজ গ্রামের প্রতি ভালোবাসা এবং গ্রামীণ সমাজ- জীবনের সঙ্গে নিজের ব্যক্তি জীবনকে মিলিয়ে দেওয়ার আগ্রহ; এছাড়া উন্নত, শিক্ষিত, রুচিশীল ব্যক্তিমনের আলোকে গড়ে ওঠা একটি স্বপ্নের জগতে নিজেকে মেলে ধরার আকাঙ্ক্ষা। আসলে, তাদের উক্ত বিপরীতমুখি সত্তাগুলি গড়ে ওঠার প্রেক্ষিতে রয়েছে তাদের সামাজিক অবস্থানের, গোপাল হলেন আধুনিক সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় গড়ে ওঠা, গ্রামীণ পরিবেশে লালিত হওয়া প্রকৃত জোতদারের প্রতিনিধি। ফলে, তার মধ্যে যেমন রয়েছে গ্রাম্য স্থূল রুচি, তেমনি জোতদার সুলভ প্রবল সামাজিক প্রতাপ ও আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য বজায় রাখবার হীন প্রচেষ্ঠা। এর জন্য সে মহাজনী বা নারী-পাচার জাতীয় যে কোনো হীন ব্যবসাকে অবলম্বন করতে পারে অনায়াসে। আবার গৃহকর্তা হওয়ার দরুন তার মধ্যে রয়েছে প্রকট সাংসারিক কর্তৃত্ব, বৈষয়িক বুদ্ধি ও অপার পুত্রস্নেহ, এ রকম চারিত্রিক গুণসম্পন্ন গোপালের সংস্পর্শে বড় হয়েছে শশী! কিন্তু নিজের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যেই হোক বা সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্যই হোক, শশীকে গোপাল শহরে পাঠায় ডাক্তারি পড়বার জন্য। ফলে শহরের রুচি- শিক্ষা-সংস্কৃতির সংস্পর্শে এবং

কুমুদের মত ব্যক্তির সান্নিধ্যে গ্রাম্য শশী পরিণত হয়েছে পাশ্চাত্য শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ চিকিৎসকরুপে। তার চরিত্রে দেখা দিয়েছে খানা ডোবা, অশিক্ষা- কুরুচিতে পরিপূর্ণ গ্রাম্য জীবনের প্রতি বিক্ষোভ; গড়ে উঠেছে Intellectual Romance-এর পিপাসা, বৃহত্তর জীবনে নিজেকে মেলে ধরার বাসনা, এখান থেকে শশী-ও গোপালের মধ্যে সম্পর্ক চির ধরেছে, রচিত হয়েছে দুস্তর মানসিক ব্যবধান এবং চেতনার দ্বন্দ্ব। ঔপন্যাসিকের উপলব্ধিতে— "তর্ক ও মতান্তর, আদেশ ও অবাধ্যতার বিরোধ।"

উপন্যাসের তৃতীয় পরিচ্ছেদ থেকেই এই বিরোধ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। শশী তার ডাক্তারি কর্তব্য পালনের জন্য অস্বচ্ছল শ্রদ্ধাভাজন, বসন্তরোগী সেনদিদিকে চিকিৎসা করেন। অন্য রোগীর 'কল' ছেড়ে নিঃস্বার্থভাবে সেনদিদিকে চিকিৎসা না করার জন্য শশীর উপর যে চাপ সৃষ্টি করে, তা মারাত্মক। এর প্রেক্ষিতে শুধু গোপালের আর্থিক লোভ-ই নয়, পুত্রের উপর নিজের কর্তৃত্বও বজায় রাখার বাসনা ছিল প্রবল; কিন্তু আধুনিক শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ, স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের অধিকারী শশী, পিতার এই নিষেধাজ্ঞা মেনে নিতে পারে নি। ফলে, গোপাল ক্ষুদ্ধ হয়ে ওঠে। পিতা পুত্রের বাক্যালাপ বন্ধ হয়ে যায়। আবার কথা বন্ধ হলেও শশীকে গোপালের ডাকতে ইচ্ছা করে কিংবা যামিনী, শশীকে নিন্দা করলে গোপাল সহ্য করতে পারে না। অর্থ্যাৎ শশীর প্রতি গোপালের অপার পুত্রস্নেহাতুর হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায় এই সকল ক্ষেত্রে।

বিন্দুকে কেন্দ্র করে পিতা-পুত্রের মধ্যে দ্বিতীয় সংঘাত সৃষ্টি হয়। বৈষয়িক কূটকৌশলী গোপাল ধনী ব্যবসায়ী নন্দর সঙ্গে বিন্দুর বিয়ে দেয়। শশী, নন্দের ঘেরাটোপে বিন্দুকে দেখতে পারে না, তাই বিন্দুকে মুক্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যে গ্রামে ফিরিয়ে আনে। এ ঘটনায় গোপাল ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে, কিন্তু এখানেও গোপালের পুত্রস্নেহের পরিচয় পাওয়া যায়— "ছেলের সঙ্গে এরকম মতান্তর গোপালের বাৎসল্যের জগতে মন্বন্তরের সমান বড় কষ্ট হয়।" পিতাপুত্রের তৃতীয় সংঘাত শুরু হয় যাদবের হাসপাতাল গড়ার টাকাকে কেন্দ্র করে। অর্থলোভী, গোপাল ঐ দায়িত্ব নিজের হাতে নিতে চেয়েছে। আদর্শবান শশী এই টাকাকে পিতার হাত থেকে বাঁচানোর জন্য ঝগড়া পর্যন্ত করেছে। এই ভাবে পিতাপুত্রের সংঘাত একদিকে যেমন উপন্যাসের কাহিনীকে মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে, তেমনি গতি সঞ্চার করে পিতাপুত্রের জটিল সম্পর্ককে পাঠকসমক্ষে এনে দিয়েছে।

সেনদিদি বৃদ্ধ বয়সে সন্তান প্রসব করলে, উৎকট হয়ে পড়ে গোপালের গ্রাম্যরুচি, যে রুচির বিকার থেকে শশী নিজেকে মুক্ত রাখার জন্য কুসুমের কামনাকে শেষপর্যন্ত উপেক্ষা করেছে, সেই রুচির বিকার গোপালের মধ্যে স্পষ্ট হওয়ায়, তার মনে দেখা দিয়েছে গোপালের প্রতি প্রবল ঘৃনা। এ কারণেই মরণাপন্ন সেনদিদির সন্তান প্রসবকালে শশী প্রথম দিকে ঘরে বসে থেকেছে, এখানে তার চিকিৎসকের কর্তব্য কিছুটা উপেক্ষিত, সেনদিদির জন্য গোপালের ব্যাকুলতার মধ্যে উৎকট নির্লজ্জতা দেখে শশী মনে মনে পিতাকে ধিক্কার জানিয়েছে। এমন কি সেনদিদির সন্তানকে তার সামনে আনলে ক্ষোভে ও ঘৃণায় খাবার ছেড়ে উঠে গেছে। পাশাপাশি পুত্রের কাছে নিজের ব্যাভিচার, অসংসম স্পষ্ট হওয়ায় গোপালের মধ্যে পুত্রের কাছে যে নিদারুণ সংকোচ দেখা দিয়েছে, তা পুত্রের প্রতি তার ভালোবাসাকেই স্পষ্ট করেছে। গোপালের এখানে স্পষ্টতর পুত্রের কাছে পরাজয় স্বীকার করেছেন। এমন কি সংকুচিত হৃদয়ে পুত্রের শারীরিক খোঁজ খবর নিয়েছেন। এদিকে পিতার অর্থনৈতিক আচরণে জর্জরিত শশীর মনের গহনে লালিত বৃহত্তর জীবনের প্রতি মোহটিকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। সে গ্রাম ছাড়ার স্থির সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে আর শশীর এই সিদ্ধান্তে গোপালের মনে সৃষ্টি হয়েছে মরুভূমি তুল্য এক শূন্যতা, রিক্ততা, পুত্রের কাছে থাকার জন্য, তাকে কাছে পাওয়ার জন্য গুরুদেবের শরণাপন্ন হয়। শশীর পরিবর্তিত ডাক্তার অমূল্যকে বিদায় দিতে চায়। এমন কি অবৈধ সন্তানটিকে কুন্দর সঙ্গে পাঠিয়ে শশীকে গ্রামে আটকে রাখতে চায়, কিন্তু তাতেও সফল না হলে, অবশেষে নিজেই গ্রাম থেকে বিদায় নেয়। বিদায় কালে পিতাপুত্রের এত দিনের সংঘাত যেন এক অপার্থিব মহিমায় দূর হয়ে যায়, ফিরে আসে পিতাপুত্রে স্নেহ-

ভালোবাসার সম্পর্কটি— "গোপালকে শশী প্রণাম করিল। সকালবেলায় স্বচ্ছ আলোয় দুজনার মুখ দেখিয়া মনে হইল না কোনদিন সামান্য বিষয়ে মতান্তর ছিল। জীবনে গতি দুজনের বিপরীতধর্মী।"— এভাবে প্রীতি পূর্ণ পরিবেশে গোপালের বিদায়ের মধ্যে দিয়ে তাদের দীর্ঘদিনের দ্বন্দ্বমুখর সম্পর্কটির অবসান ঘটল।

উপন্যাসের প্রায় সর্ব অংশে, বিক্ষিপ্ত পরিসরে এই দ্বন্দ্বমুখর উপখ্যানটির মধ্যে দিয়ে পাঠক অনুভব করেছে, সমকালের সংকীর্ণতা ও প্রগতিশীলতায় গড়া মধ্যবিত্ত সমাজের বাস্তবরূপ, সেখানে শশীর মত প্রগতিশীল ব্যক্তি কিংবা গোপালের মত সংকীর্ণ বৈষয়িক পুরুষ- কেউই নিজের মনের মতন করে, ঋজুগতিতে জীবনপথকে গড়তে পারে না বা চলতে পারে না, পারস্পরিক আঘাতে একে অপরের চলার পথে হয়ে ওঠে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। শশী যেমন স্বপ্নের জগতে নিজের শেষপর্যন্ত গোপালের জন্যই মেলে ধরতে পারে নি– একথা নিশ্চিত। তবে একথাও সঠিক যে, সামাজিক কারনে দ্বন্দ্ব যতই পিতাপুত্রের মধ্যে মানসিক সংঘাত ঘটাক না কেন, রক্তের টান বা স্নেহের টান কিন্তু চিরন্তন বা শাশ্বত! এই রক্তের টানই একটি সূক্ষ্ম অথচ গভীর সংযোগের সেতু নির্মাণ করেছে পিতাপুত্রের মধ্যে গোপালের মধ্যে যে স্পষ্ট পুত্রস্নেহ এবং বিক্ষুব্ধ শশীর যে গভীর পিতৃভক্তি উপন্যাসের শেষপর্যায়ে লভ্য হয়ে উঠলো, তাতে চিরন্তন পিতা-পুত্রের জাগতিক সম্পর্কটিকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। অথ্যাৎ এই সত্যটিকেই উপলব্ধি করায় যে, স্নেহের কাছে সবকিছুই পরাস্ত হয়।

জ

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালজয়ী উপন্যাস 'পুতুল নাচের ইতিকথা'-য় (১৯৩৬) শশী নামক মূল চরিত্রের চলমান জীবনপথে এবং ব্যক্তিভাবনার বিভিন্ন স্তর উন্মোচনের মধ্যে দিয়ে, আখ্যান কে একটি নির্দিষ্ট পরিণতির দিকে নিয়ে গেছেন লেখক; যেখানে শশীর জীবনপটে একাধিক চরিত্র- ঘটনা, কার্যকারণ সম্পর্ক সুত্রে নিবদ্ধ হয়ে উপন্যাসটিকে অভিনবত্ব ও স্বাতন্ত্র্যতা দান করেছে। মতি-কুমুদ এরকমই দুই চরিত্র, যাদের সম্পর্কের টানাপোড়েনের ইতিকথা, তাদের চরিত্র বিশ্লেষণ, একাধিক দৃষ্টিকোণে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় উপন্যাসে স্থাপন করেছেন পরিবেশ সৃজনের ক্ষেত্রে, আবার মূল চরিত্র- কাহিনির জীবনপট থেকে যথাসময়ে বিদায় দিয়েও পাঠকের আকর্ষণকে দৃঢ়বদ্ধ করেছেন। তাই উপন্যাস অবয়বে মতি- কুমুদ সম্পর্কটি তাৎপর্যপূর্ণ হয়েছে।

কুমুদ ছিল শশীর কলকাতার কলেজ জীবনের বন্ধু, নাগরিক সভ্যতার প্রতিভূ; তার খাম খেয়ালী- স্বভাব, চরিত্রের উদ্দামতা, শেলী-বায়রন- হুইটম্যানের রোমান্টিক পিপাসা, ব্যক্তিত্বের চটুলতা, শশীকে শুধু অভিভূত-ই করেনি, সেই সঙ্গে তার মানসিকতারও মননের মধ্যে জাগিয়েছিল Intellectual রোমান্সের বাসনাও, পক্ষান্তরে, গাওদিয়ে গ্রামের সরল-সহজ বালিকা মতির প্রতি ছিল শশীর স্নেহমিশ্রিত ভালোবাসা ও গভীর মমতা, হারুঘোষের বাড়ির সঙ্গে শশীর ঘনিষ্ঠতার অন্যতম কারণও হয়ত বা মতি; শশীর মনকে প্রভাবিত করা, এই দুই নরনারীর (কুমুদ- মতি) সাক্ষাৎ ঘটল উপন্যাসের চতুর্থ পরিচ্ছেদে।

প্রথমে পূজা উপলক্ষে যাত্রা করতে আসা কুমুদ মনকে হালকা করতে শশীর বাড়ি থেকে হারু ঘোষের বাড়ির পিছনে তালপুকুরের ধারে হাজির হলে, হঠাৎ সাপের কামড় খেয়ে সে চিৎকার করে ওঠে আতঙ্কে; চিৎকার শুনে ছুটে আসে মতি, ঘটল তাদের প্রত্যক্ষে পরিচয়। যদিও এই, পরিচয়ে পারস্পরিক কোন আকর্ষণ-ই ব্যক্ত হয় নি, কিন্তু এখান থেকেই সম্পর্ক সৃষ্টির একটা ক্ষেত্র তৈরি হয়ে গেছিল। তাই দেখা যায়, যাত্রার আসরে নবপরিচিত কুমুদকে প্রবীর বেশে দেখে মতি কেমন বিস্ময় মুগ্ধ হয়ে যায়। রাজপুত্র প্রবীরের প্রেমাভিনয় দেখে মতির বিস্ময়মুগ্ধ মনে দেখা দেয় চঞ্চলতা আর এই অবস্থায় কুমুদ যখন মতির মনের গহনে অচিরেই স্থান করে দেন, তখন অবচেতনেই মতি কুমুদকে ভালোবেসে ফেলে। তাই কুমুদ যখন পরিহাস করে বলে— "যেন তোর সঙ্গেই করছে,— না?" তখন— "মতির বুকের ভিতর শিরশির করে"— বোঝা যায় রাজপুতবেশী

কুমুদের প্রতি মতির মনে একটা প্রচ্ছন্ন অনুরাগ গড়ে উঠেছে।

পরের দিন এই সুপ্ত অনুরাগ স্পষ্ট হওয়ার মতন পরিবেশ গড়ে ওঠে, মতি তালপুকুরের ধারে হারানো মাকড়ি খুঁজতে এলে। এখানে তাদের দ্বিতীয় সাক্ষাৎ— "উভয় পক্ষই কৃতার্থ হইয়া গেল।" মতি মাকড়ির পরিবর্তে পেল কুমুদকে। কুমুদও মতির প্রতি অনুভব করল গভীর অনুরাগ। যে অনুরাগ বশতঃ তিনি মতিতে মাকড়ি কিনে দিতে চায় আবার— "মতির মনে হয় মাকড়ি কেনার আগে প্রবীর তাহাকেই কিনিয়া ফেলিয়াছে।" মাকড়ি কিনে দেওয়াকে কেন্দ্র করে তাদের মধ্যে পুনরায় সাক্ষাৎ ঘটেছে। এখানেই নির্জন দুপুরে তালপুকুরের ধারে, রোমান্টিক পরিবেশে তাদের ভালোবাসা আরও নিবিড় হয়েছে, এখানে আমরা দেখতে পাই মতির ভালোবাসাকে উপভোগ করার জন্য ব্যাকুল কুমুদকে, তাই সে মতির কাজে জানতে চায়— "আমি মরে গেলে তুমি কি করতে?" আর এই উত্তরে মতি যখন বলে— "কি জানি কি করতাম।" কিংবা "দুর! মরার কথা বলতে নেই।"— তখন আমরা মতির আদর্শ প্রেমিকা হৃদয়ের লজ্জা ও ভালোবাসার দ্বৈত প্রকাশটিকে অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করি, এর পর কুমুদ চলে যাওয়ার দেখা গেছে মতি বিচ্ছেদ যন্ত্রনায় কাতর হয়েছে। তাই সে বারংবার শশীর কাছে খবর চায়। এমনকি তাকে দেখবার জন্য কলকাতা পর্যন্ত হাজির হয়।

কুমুদও মতিকে ছেড়ে বেশি দিন থাকতে পারে না। ষষ্ঠ অনুচ্ছেদে আমরা দেখি। কুমুদ পুনরায় গাওদিয়ায় হাজির হয়েছে। তার বিরহ ব্যাকুল চেহারায় ঘটেছে আমূল পরিবর্তন— "এবার সে যে বহুদিন আগেকার মত কবি ও ভাবক হইয়া উঠিয়াছে..... কি যেন সে ভাব। কী এক রসালো ভাবনা। চোখের দৃষ্টি তাহার হইয়া আসে উৎসুক এবং একান্ত বেমানানভাবে সেই সঙ্গে মুখে ফুটিয়া থাকে গভীর সন্তোষ।" কুমুদের চেহারায় এই আমূল পরিবর্তনের বাস্তব কারণ সকলের সামনে উদঘাটিল হলে ঘটেছে মতি-কুমুদের বিবাহ। পরিণতিতে লাভ করেছে তাদের প্রেম এরপর উপন্যাসের দশম ও একাদশ পব জুড়ে তাদের দাম্পত্য জীবন পর্ব ব্যক্ত হয়েছে।

মনের মতন স্বামী পেয়ে মতির হৃদয়ে দেখা দিয়েছে উৎফুল্লতা। সে উৎফুল্ল মনে পূর্ব পরিচিত কলকাতাকে দেখে অবাক হওয়ার ভান করে স্বামীকে খুশী করে। স্বামীর ভালোবাসায় আপ্লুত হয়ে যায়। তার শারীরিক সান্নিধ্যে তৃপ্তি লাভ করে, আবার কখনও জয়া- কুমুদের হৃদ্যতা উপলব্ধি করে ইর্ষান্বিত হয়। এক কথায় এই পর্বে তার সারাৎসার উপলব্ধি হল— "আমি ওর কতজন্মের বউ জানো?" অন্যদিকে, কুমুদ নিজের সৃষ্টিছাড়া জীবনপ্রবাহের সঙ্গে মতির জীবনস্রোতকে মিশিয়ে দেওয়ার আকাঙ্ক্ষাকে সার্থকভাবে সম্পূর্ণ করতে পেরেছিল। মতি তার মনের মতন করে পড়ে উঠেছে। তাই দেখা গেছে, উপন্যাসের শেষে মতি কূট- কৌশলে সকলকে ফাঁকি দিয়ে ট্রেনের কামরায় কুমুদের সঙ্গে অনিশ্চিত জীবনকে পাথেয় করে নেয় এবং শেষে গাওদিয়া গ্রামের তালপুকুরের ধার থেকে হাওড়া স্টেশনের রেল কামরা পর্যন্ত একটি সংক্ষিপ্ত উপখ্যানের "ইতি" ঘটে।

বলা বাহুল্য, উপন্যাসটি নিঃসন্দেহে উপভোগ্য, কিন্তু পাঠকমনে কৌতুহল জাগে, উপন্যাসে এই কাহিনির সার্থকতা সম্পর্কে। আসলে, উপন্যাসটি আপাত বিচ্ছিন্ন মনে হলেও আমর গভীর পর্যবেক্ষণ জনিত উপলব্ধির নিরিখে দেখতে পাই, উপন্যাসে মূল প্রতিপাদ্য শশীর ব্যক্তিভাবনার সঙ্গে কাহিনিটি বিচ্ছিন্ন নয়। অথ্যাৎ শশীর intellectual রোমান্স পিপাসা, যে কুমুদকে ও তার উপলব্ধিকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছিল, সেই কুমুদকেই যখন তিনি গাওদিয়া গ্রামে এসে যাত্রা করতে ও মতির মতন গেঁয়ো মেয়েকে বিবাহ করতে দেখে, তখনতার রোমান্টিক ভাবনা কিঞ্চিত আঘাত প্রাপ্ত হয়; মনে হয়, সেই রোমান্স, পিপাসা— "চায়ের ধোঁয়ার মত, জলীয় বাষ্প ছাড়া আর কিছু নয়।" এই ভাবনা থেকেই শশীর গ্রাম-মমত্বটি মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে— বলা যায়। আবার কুসুমের মতো না হলেও মতির প্রতি শশীর একটা প্রচ্ছন্ন ভালোবাসার একটা সুপ্ত কামনা ছিল, কুসুমের ঈর্ষা এই সত্যতা প্রমাণ করে, তাই বলা যায়, শশী-মতি কুমুদ মিলে উপন্যাসের একটি জটিল ত্রিকোণ প্রেম সম্পর্ক সৃষ্টির প্রেক্ষিতে উক্ত উপন্যাসটি স্পষ্ট ভূমিকা নিয়েছে। পরিশেষে বলা যায়, উপন্যাসটি প্রতিটি চরিত্রের

জীবন-ব্যর্থতার উপলব্ধিতে ভরপুর, সেক্ষেত্রে মতি-কুমুদ এর সার্থক প্রেমকাহিনিটি জীবনের ইতিবাচক দিকটি প্রকাশে গৌরবান্বিত হয়ে উঠেছে। সুতরাং সবদিক থেকে বিচার-বিশ্লেষণে মতি-কুমুদ সম্পর্কের ইতিকথাটি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিল্প কুশলতার পরিচায়ক।

ঝ

কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (জন্ম ১৮৭৬ এর ১৫ই সেপ্টম্বর- ১৯৩৮ এর ১৬ ই জানুয়ারী) সাহিত্যপথের সুযোগ্য উত্তরাধিকারী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮ এর ১৯শে মে জন্ম- ১৯৫৬ এর ৩রা ডিসেম্বর) এর সাহিত্য ভাবনায়, শরৎচন্দ্রের চিন্তা-চেতনা, দৃষ্টিভঙ্গী দুলর্ভ-প্রভাবমুক্ত। সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় শরৎচন্দ্রের সৃষ্ট পথে হাঁটেন নি, এক পৃথক দৃষ্টিকোণে সমকালীনতা, মধ্যবিত্তের অস্তিত্বের সংকট মানিকের সাহিত্যে বারংবার উঠে এসেছে। পক্ষান্তরে, অন্তরের অনুভূতিতে স্পর্শ করে শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে রূপ পেয়েছে অধঃপতিত, অসহায়, লাঞ্চিত মানুষের দল এবং অন্তঃপুরের নারীরা— 'মেজদিদি', 'অরক্ষণীয়া', 'বিরাজ বৌ', 'চরিত্রহীন', 'দত্তা', 'দেনাপাওনা', ইত্যাদি ছোটগল্প উপন্যাসে তার প্রমাণ মেলে; যেখানে তথাকথিত কায়েমি স্বার্থ বিরোধিতা দেখান হয়েছে সমাজের- ব্যক্তিমনের মূল্যবোধের বিপরীতে। মানবদরদি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গল্প উপন্যাসে নিপীড়িত নরনারীর প্রতি লেখকের মমত্ববোধ সহানুভূতিশীলতা অত্যন্ত স্পষ্ট। বিপরীতে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রগতি লেখকসংঘ ও আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন, তাই আত্মসচেতনবিদ, বিজ্ঞানের ছাত্র মানিক কখনই লালিত সৌন্দর্যবোধ ও মন্ত্রমুগ্ধ সৌন্দর্যের আরাধনা করেন নি তার সাহিত্যে; উপরন্তু জীবন যুদ্ধে ইতিবাচক দিকের পাশাপাশি নেতিবাচক মূল্যবোধ, বাস্তবতাবোধ, যুক্তিবাদী ভাবাবেগ তাঁর সাহিত্য সম্ভার কে সম্পৃক্ত করেছেন, 'কল্লোল' পত্রিকার মাধ্যমে প্রগতিশীল জীবন চেতনায় স্নাত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রগতিশীল সাহিত্যে তাই ধরা পড়েছে সমাজের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ, মার্কসবাদ, মনোবিজ্ঞানী ফ্রয়েড, ইয়ং, এড্‌গার প্রমুখের মনোবিকলন তত্ত্ব বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ- যা থেকে জন্ম নিয়েছে মানুষ- জীবনের প্রতি অদম্য ভালোবাসা, এই ভালোবাসাই আবার দরদী কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের সাহিত্য ভান্ডারের প্রাণ। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে থেকে ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সমাজের দুঃখ-দুর্দশা, অর্থনৈতিক সামাজিক মূল্যবোধের ভাঙ্গনে, তথা সামন্ততান্ত্রিক সমাজের অবক্ষয়-ই যেন ভালোবাসার মোড়কে শরৎসাহিত্যে উঠে এসেছে। তাই কোথায় যেন উভয় কথাশিল্পীর মননবোধ মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে; চরিত্রভাবনায় ঐক্যতা সূচিত হয়েছে অজান্তেই।

স্রষ্টার ব্যক্তিগত জীবন যেমন সাহিত্য সৃষ্টির সহায়ক, তেমনি পারিপার্শ্বিক সমাজ ও সাহিত্যে বিপুল প্রভাব বিস্তার করে— একথা অনস্বীকার্য, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় উভয় শিল্পীর জীবনবেদ-দর্শন, ভিন্ন, তাই ভিন্ন চিন্তাধারায় 'পল্লীসমাজ' উপন্যাসের নায়ক রমেশ এবং 'পুতুল নাচের ইতিকথা' উপন্যাসের কেন্দ্রিয় চরিত্র শশী আবর্তিত; তবু তুল্য-মূল্য বিচার বিশ্লেষণে উভয় চরিত্রই যেন পল্লীসমাজ জীবনের হীন বেড়াজালে নিজেদের আবদ্ধ করে, গ্রামের বঞ্চিত নিপীড়িত মানুষকে ন্যায়ধর্ম ও মনুষ্যত্বের পথ দেখাতে চেয়েছে। সমাজে বহুদিনের লালিত, পুঞ্জিভূত ঈর্ষা- সঙ্কীর্ণতা-স্বার্থ পরতার মাঝে প্রাণরসের চেতনা নিয়ে এসেছে। যদিও উভয়েই শেষপর্যন্ত নারীমনের উষ্ণ রিক্ত ভালোবাসায় পরিপূর্ণ হতে পারে নি, বেদনা বিক্ষোভের অরুণরাগে উভয়ের নিঃসীম ভালোবাসা স্বপ্ন বাস্তবতার আঘাতে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে, ব্যর্থ হয়ে গেছে গ্রামীন জীবনে আদর্শ প্রতিষ্ঠার ইতিকথা, তবুও জীবন অন্বেষণের পথ বেয়ে রমেশ- শশীর স্বপ্ন সার্থক বলা চলে।

'পল্লীসমাজ' উপন্যাসের নায়ক রমেশ, পেশায় শিক্ষক, জ্ঞান-প্রজ্ঞার আলোকে কুঁয়াপুর গ্রামে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন নিয়ে প্রবেশ করেছে উপন্যাসের সূচনায়। আদর্শকে হাতিয়ার করে ন্যায়ের ও সত্যের পথে পল্লীসমাজের নীচতা-দীনতা দূর করতে এসেছে, 'পুতুল নাচের ইতিকথা' উপন্যাসের নায়ক শশী, পেশায়

ডাক্তার, সংস্কার পূর্ণ গাওদিয়া গ্রামকে ভালোবাসার-আত্মমমতায় বেঁধে ফেলে অচিরেই গ্রামের অতি সাধারণ মানুষগুলিকে আপন করে নিয়ে লড়াই করেছে নিজের মনের সঙ্গে, পিতার ভাবনার সঙ্গে, অর্থাৎ উভয় চরিত্র-ই— রমেশ ও শশী গ্রামীণ সমাজের মঙ্গলকামনার মধ্যে দিয়ে যাত্রা সুচনা করেছে। এদের মধ্যে রমেশ অন্যায়-এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে কারাবরণ করলেও সমাজ সংস্কারে নিরুৎসাহ মনোভাব কখনই পোষণ করেনি, উপরন্তু বিচিত্র অবিজ্ঞতা লব্ধ রমেশের মন আরও দঢ়প্রত্যয়ী হয়েছে কুঁয়াপুর গ্রামে উন্নতি প্রতিষ্ঠায় পক্ষান্তরে, শশী চরিত্রটির মূল আদর্শ-ভাবনা-চিন্তা- চেতনা উপন্যাসের সূচনায় কখনই গাওদিয়া। গ্রামকেন্দ্রিক ছিল না। দীর্ঘদিন বসবাসের পর ও একাধিক মানুষের সান্নিধ্যে আসার পর শশীর মনোলোকে গ্রাম সম্পর্কিত ভাবনা চিন্তা প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। সাধারণ মধ্যবিত্তের দ্বন্দ্ব জটিল মানসিকতার প্রতিভূ শশী চরিত্রটি; তাই স্বপ্ন ও বাস্তবের দ্বন্দ্ব সর্বদাই সমান্তরালে তার মনোলোকে ক্রিয়াশীল, গাওদিয়ার মানুষজনের প্রতি অদম্য টান-ই পরাজয়ের গ্লানি-ই শেষ পর্যন্ত তাকে এই গ্রামে চিকিৎসক রূপে থেকে যেতে সাহায্য করেছে। তাই আপাতভাবে উভয় চরিত্রের ভাবনা-চিন্তা পৃথক হলেও, নীতিজ্ঞান ও আদর্শ প্রতিষ্ঠার দিক দিয়ে, বিপন্ন মানুষগুলির পাশে দাঁড়িয়ে, তাদের জন্য ব্যক্তিকেন্দ্রিক জীবনটাকে উৎসর্গ করতে কখনই পিছপা হয়নি উভয়ই— এখানে দুটি চরিত্রের মধ্যে নিঃসন্দেহে সাদৃশ্য রয়েছে।

কুঁয়াপুর ও গাওদিয়া পৃথক গ্রাম হলেও, উভয়গ্রামেরই জীবন বেদ অভিন্ন। 'পল্লীসমাজ' উপন্যাসে রমেশের দৃষ্টিকোণে কুঁয়াপুর ও 'পুতুল নাচের ইতিকথা'-য় শশীর দৃষ্টিতে গাওদিয়ার প্রকৃতি, অর্থনৈতিক বিপন্নতা, নিরন্ন-অসহায় মানুষগুলির দৈন্যতা বড়ই স্পষ্ট-অভিন্ন। রমেশ পিতৃশ্রাদ্ধের দিন গ্রাম্য সমজপতিদের কুসংস্কার বদ্ধ হীন স্বার্থান্বেষী মনোভাবের পরিচয় পেয়ে, গ্রামের বিষাক্ত সংকীর্ণতাকে অচিরেই চিনে ফেলেছে। পরশ্রীকাতরতা ও ধর্মীয় বেড়াজালে ঘেরা গ্রামে বড় হয়ে উঠেছে হতভাগ্য মানুষগুলির বিবর্ণ ইতিকথা। রমেশের উপলব্ধিতে ধরা পড়েছে জাতিভেদ ও সামন্ততন্ত্রের গোষ্ঠীকেন্দ্রিক নীচ মনোভাব। তবু ও এই জরাজীর্ণতার মধ্যে থেকেও রমেশ তার আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে। গ্রামেরই বেনীঘোষাল, ধর্মদাস, গোবিন্দ গাঙ্গুলী, দীনু ভট্টাচার্য, বাঁড়ুয্যে মশাই প্রমুখের কাছ থেকে ভর্ৎসনা, নিরুৎসাহ, নিমর্মতা পেয়েছে! তবুও অশিক্ষায় পরিপূর্ণ গ্রামকে জ্ঞানের আলোকে প্রজ্জ্বলিত করতে চেয়েছে। বিদ্যায়তনের জন্য তার অন্তরের অনুরাগে কল্যাণবোধ, জাতিধর্ম নির্বিশেষে মনুষ্যত্ববোধের প্রতিষ্ঠা, থেমে থাকেনি। পক্ষান্তরে, আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্ন নিয়ে গ্রামে প্রবেশের মুহূর্তেই হারুঘোষের, প্রকৃতির রোষে মৃত্যু যেন শশীর মনোলোকে প্রশ্নচিহ্ন জাগিয়ে তুলেছে। পিতা গোপালের পিতৃসত্তা সম্পর্কে বিরোধ জন্মেছে। তাই পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে, নিজের আদর্শকে কর্তব্যকে অবহেলা করতে পারেনি। সেনদিদির চিকিৎসা করতে গিয়ে যমের সঙ্গে নিয়ত সংগ্রাম করেছে, যামিনী ও পিতার সঙ্গে ও এ নিয়ে বিরোধ জন্মেছে, তবু গাউদিয়া গ্রামের বিপন্ন মানুষগুলিকে রোগমুক্ত করতে চিরজীবনের মতন গ্রামেই থেকে গেছে শশী। প্রবল আত্মমর্যাদা বোধ ও আত্মসমালোচনায় প্রখর চরিত্রটি। রমেশের মতই কুসংস্কারের বিপরীতে বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ প্রতিষ্ঠায় তৎপর।

রমেশ ও শশী উভয়েই পরাজিত মানবাত্মা; রমেশ, বাল্যজীবনের সাথী ও বিধবা রমার কাছ থেকেও পরিণত ভালোবাসার পরিবর্তে নিষ্ঠুরতাই পেয়েছে, রমার কায়েমী স্বার্থপর মনোভাব তাকে অন্তরে বিদ্ধ করেছে, অথচ হিন্দু সমাজাদর্শ থেকে রমেশ বিচ্যুত হয়নি। জটিল ও দুরধিগম্য সম্পর্ক যেন ফল্গু স্রোতের মতই রমা রমেশের সম্পর্কের মধ্যে রয়ে গেছে। রমা, রমেশকে ভালোবেসে কখনই সামাজিক ও বৈষায়িক জটিলতা থেকে উর্দ্ধে উঠতে পারে নি, বিবেক-অন্তর্দ্বন্দ্ব-সন্দেহ-অনুযোগ এ উপন্যাসে যেন রমার প্রাণসত্তার প্রতিবিম্ব। রমার অন্তরের দ্বিবিধ সত্তা বর্তমান। একদিকে জমিদার গৃহে অজন্ম প্রতিপালিত কন্যা-ভগিনী, অপর দিকে শাশ্বত নারী হৃদয়ের আবেগমথিত সত্তা। একদিকে বৈষয়িক স্বার্থপর মনোভাব, ভ্রাতার প্রতি দ্বায়িত্ববোধ; অপরদিকে

রমেশের সত্যাদর্শ, কল্যাণবোধের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা। এই দ্বিবিধ মনোলোকের আলোড়নে আবার রমেশের অন্তর দ্বিধাবিভক্ত। একদিকে পল্লীগ্রামের নিষ্ঠুর-নীচ সমাজের সঙ্গে প্রতিনিয়ত আন্দোলনে রমেশ ন্যায় প্রতিষ্ঠার তৎপর; অপরদিকে রমার আপাত মনোভাব রমেশকে ভাবিয়ে তুলেছে। অথচ এই রমাই, রমেশকে তারকেশ্বরের একটি দিনে যত্ন করে খাইয়াছে। দীপশিখা, নিষিদ্ধ ও সমাজগর্হিত ভেবে একাকী হৃদয়মধ্যে লালিত করেছে আজীবন। পক্ষান্তরে, 'পুতুল নাচের ইতিকথা' উপন্যাসে শশীর নিঃসঙ্গ জীবনের সঙ্গী হয়েছে হারুঘোষের পুত্রবধু, বাল্যবন্ধু পরাণের স্ত্রী-কুসুম এবং হারু ঘোষের অসুস্থ কন্যা মতি, কল্পনা পিপাসু শশীর একদা মনে হত— "একদিন কেয়ারী করা ফুলবাগানে মাঝখানে বসানো লাল টাইলে ছাওয়া বাংলোয় শশী খাঁচার মধ্যে কেনারি পাখির নাচ দেখিবে।" এবং তার স্ত্রী আভিজাত্যের মোড়কে আবৃত হয়ে— "দামী ব্লাউজে ঢাকা বুকখানা শশীর বুকের কাছে স্পন্দিত হইবে," অর্থাৎ গ্রামে আসার পূর্বে বা আসার ঠিক পরই শশী অবচেতনে স্বপ্ন আকাঙ্ক্ষাকে তীব্রভাবে লালিত করেছে, কুসুম জৈবিক প্রবণতায় ও অনাবৃত প্রেমের প্রকাশ নিয়ে শশীর প্রতি আকর্ষিত হয়েছে, অথচ সমাজের সংস্কার, নীতিবোধ, শিক্ষাকে ছাপিয়ে প্রথম দিকে শশী কুসুমের দেহনির্ভর প্রেমকে প্রশ্রয় দেয়নি, তাকে সান্নিধ্যে পেয়েও দূরে সরিয়ে মহান হওয়ার বাসনা করেছে। অথচ যখন পরবর্তী ক্ষেত্রে শশী একাকী নিঃসঙ্গ হয়েছে, কুসুমের উষ্ণ সাহচার্য পেতে উন্মুখ, তখনই কুসুম, শশীর থেকে দূরে সরে গেছে। আবার, মতির চোখ দিয়েই যেন গাউদিয়া গ্রাম প্রকৃতিকে শশী ভালোবেসেছে এবং শশীর-ই মধ্যস্থতায়, তার কলকাতার বন্ধু কুমুদের সঙ্গে মতির বিবাহের ব্যবস্থা ও হয়েছে। তবে কুসুমের নারী হৃদয়ের ভালোবাসাকে শশী উপেক্ষা করতে যেমন পারেনি, তেমনি শশীর অপারগতায় কুসুম শশীর জীবনকে শূন্য-রিক্ত করে দিয়ে চলে গেছে।

রমেশ ও শশীর জীবনের পরিণতি ও সামঞ্জস্য পূর্ণ— উভয়ের জীবনের ট্র্যাজিডি মর্মান্তিক। উপন্যাসের পরিণতিতে, রমা, রমেশকে গ্রাম্য ত্যাগ করে, আদর্শকে জলাঞ্জলি দিয়ে অন্যত্র যাওয়ার জন্য মিনতি করেছে। ভাগ্য বিড়ম্বিতা রমার জীবনে রমেশের ভালোবাসা, শ্রদ্ধার সঙ্গে গোপনে লালিত হয়েছে। তার বৈধব্যজীবনে কাঙ্ক্ষিত রমেশ চিরকালই ট্র্যাজেডির নায়করূপে রয়ে গেছে। তাই গ্রামের সমস্ত অপযশ নিন্দা মাথায় নিয়ে, দুর্ভাগ্যকে সঙ্গী করে ভালোবাসার প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য রমা দূর তীর্থস্থানে যাত্রা করেছে, আর রমার অন্তরের গভীর শ্রদ্ধানুরাগে রঞ্জিত রমেশের স্বপ্ন চূর্ণ হয়ে গেছে। রমেশ সীমাবদ্ধ গ্রামের সংস্কার-শোষণ-অর্থনৈতিক বিপন্নতা-দূর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে, শেষ পর্যন্ত নিজের জীবনে ট্র্যাজেডি নিয়ে এসেছে। পক্ষান্তরে, 'পুতুল নাচের ইতিকথা' উপন্যাসে দেখা যায়, শশী ক্রমশই অন্তর্দ্বন্দ্বে ও পিতা গোপালের ভাবনার সঙ্গে দ্বন্দ্ব করতে ট্র্যাজেডির পথে এগিয়ে গেছে, সম্পর্কের দ্বন্দ্ব বারংবার শশীর স্বপ্নকে আঘাত করে বাস্তবের রূঢ়ভূমিতে নিয়ে এসেছে। একদিকে মতি-কুমুদের বোহিমিয়ান জীবনতৃষ্ণা, বিন্দুর উৎশৃঙ্খল জীবনোপভোগ শশীর মানসিকতাকে সাহসী করে তোলার প্রাক্কালেই কুসুম গাউদিয়া ছেড়ে চলে যাওয়ার নিশ্চত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে। শশীর হৃদয়ের প্রেমকে উজ্জীবিত করে, শশীকে নিঃসঙ্গ, রিক্ত-শূন্য ট্র্যাজেডির নায়কে পরিণত করে, গাউদিয়া গ্রাম ছেড়ে চলে গেছে। অপরদিকে, চিকিৎসক শশী সেনদিদিকে, পুত্র প্রসবকালে বাঁচাতে না পেরে, নিজের চিকিৎসক সত্তার কাছেই পরাজিত হয়েছে। পিতা গোপালের সঙ্গে বৃত্তীয় দ্বন্দ্বে পাঁক খাওয়া শশী, মধ্যবিত্তের আত্মগ্লানি, দ্বিধা দ্বন্দ্বময় মনোভাব থেকে উত্তীর্ণ হতে পারেনি। গাউদিয়া গ্রামেই বাঁধা পড়ে নিঃসঙ্গ, একাকী শশী জীবনের সম্পর্কের হিসেব কষতে বসেছে; গোপাল সেনদিদির পুত্রকে নিয়ে চিরকালের জন্য, সংসার ছেড়ে গাউদিয়া ছেড়ে চলে গেছে, শশীর ভরপুর-নিটোল, কাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন গুলিকে ভেঙ্গে দিয়ে, তাই— "মাটির টিলাটির ওপর উঠিয়া সূর্যাস্ত দেখিবার শখে এ জীবনে আর একবারও শশীর আসিবে না।" শশীর স্বপ্নময় সত্তা, এখানেই রমেশের ন্যায়-আদর্শের সত্তার সঙ্গে মিলে-মিশে একাকার হয়ে উভয়কে ট্র্যাজেডির

প্রতীকে রূপায়িত করেছে।

গ্রন্থপঞ্জি:

১। রায়চৌধুরী, গোপীকানাথ। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়: জীবনদৃষ্টি ও শিল্পরীতি। প্রথম প্রকাশ, দে'জ পাবলিশার্স, কলকাতা।

২। ভট্টাচার্য, মালিনী। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় একটি জীবনী। বহুস্বর প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ ২০২১, ISBN: 978-81-94255-92-5.

৩। মজুমদার, সমরেশ। পুতুল নাচের ইতিকথা উপন্যাসের মৌলিক নির্মান। রত্নাবলী, কলকাতা-৭০০০...

৪। মন্ডল, স্বস্তি। শশীর স্বপ্ন বাস্তব: পুতুলনাচের ইতিকথা। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, পরিবেশক বামা পুস্তকালয়, কলকাতা-৭০০০৭৩।

৫। বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা। পুনর্মুদ্রণ—২০০৬-২০০৭, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা- ৭০০০৭৩।

৬। মিত্র, সরোজ মোহন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুতুল নাচের ইতিকথা। প্রজ্ঞা বিকাশ প্রকাশনী, কলকাতা-৭০০০০৯।

৭। বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক। পুতুল নাচের ইতিকথা। ভূমিকা: রজত কুমার সুর, ফাল্গুন-১৪২৯, মোহাম্মদ সালাউদ্দিন, সালাউদ্দিন বইঘর প্রকাশনা, ঢাকা-১১০০, ISBN: 978-984-89350-2-9.